শিক্ষামূলক কাহিনী

॥ শ্রীহরি ॥

বুদ্ধিমান ভবঘুরে

একদল ভবঘুরে ছিল। তারা কয়েকটি বলদের পিঠে করে মাটি ভর্তি করে দিল্লী যাচ্ছিল। পথে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় অনেক মাটি বিক্রী হয়ে গেল। বলদের পিঠে যে মাটি ছিল তার অর্ধেকই খালি হয়ে গেল আর মাত্র অর্ধেক মাটি ছিল। মাটি একদিকের খালি হয়ে যাওয়ায় ভার যেদিকে ছিল সেদিকে ঝুঁকে গেল। সঙ্গের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল কী করা যায় ? তখন তাদের সরদার বলল, 'আরে, ভাবার কি আছে ? খালি থলেগুলোতে বালি ভর্তি করে নাও। এই রাজস্থানের জমিতে বালির অভাব নেই।' লোকেরা তখন খালি থলেতে বালি ভরে নিল। বলদের পিঠের একদিকে থলেভর্তি বালি আর অপরদিকের থলেতে মাটি রইল।

এক ভদ্রলোক দিল্লী থেকে আসছিলেন। তিনি বলদের পিঠের থলে থেকে বালি পড়তে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'থলেতে বালি কেন ?' লোকেরা বলল—'ওজন ঠিক করার জন্য।' তিনি বললেন—'আরে, তোমরা এ কি বোকামি করছ ? তোমাদের সরদার আর তোমরা একই রকম। বলদের পিঠে মিথ্যে ভার চাপিয়ে ওকে মেরে ফেলছ ! মাটিগুলোই আধা আধি করে এক একজনের পিঠে চাপালে কিছু বলদ তো ভার বিহীন হয়েই যেতে পারত।' লোকেরা বলল—'আপনার কথা তো ঠিকই, কিন্তু আমাদের সরদার যা বলবেন আমরা তো তা-ই করব। আপনি গিয়ে যদি আমাদের সরদারকে এই কথা বলে অনুমতিটা নিয়ে আসুন !' ভদ্রলোক তখন গিয়ে সরদারের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাকে এই কথা বললেন। সরদার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন ? কোথায় যাবেন ?' তিনি বললেন—'আমি হরিয়ানায় থাকি। রোজগারের জন্য দিল্লী গিয়েছিলাম। কিছুদিন ওখানে ছিলাম, কিন্তু অসুখে পড়ে গেলাম। তাই যা রোজগার করেছিলাম তার সবই খরচ হয়ে গেছে। ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে গেল। হাতে কিছুই রইল না,

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

তাই চিন্তা করে দেখলাম, বাড়ি যাওয়াই ভালো।' ভদ্রলোকের কথা শুনে সরদার তার লোকেদের বলল—'এঁর কথা শুনে লাভ নেই। আমরা যেমন যাচ্ছি, তেমনই চলো। এঁর বুদ্ধি ভালো বলে মনে হলেও, এঁর ফল তো ভালো হয়নি। যদি বুদ্ধি ঠিক হতো তাহলে ইনি ধনী হয়ে যেতেন। আমাদের বুদ্ধি ভালো বলে মনে না হলেও, এর ফল তো ভালোই হয়েছে। আমি কখনও আমার কাজে লোকসান খাইনি।'

ভবঘুরের দল বলদদের নিয়ে দিল্লী পৌঁছে গেল। সেখানে তারা জায়গা ভাড়া করে মাটি আর বালি আলাদা করে রাখল আর লোকেদের বলল যে বলদগুলিকে নিয়ে জঙ্গলে যেতে যাতে বলদগুলি ঘাসে চরতে পারে। কেননা শহরে বলদদের রাখলে তাদের ঘাস-জল কিনে খাওয়াতে হবে, তাহলে লাভ হবে কী করে ? মাটি বিক্রী হতে লাগল। এদিকে দিল্লীর বাদশাহ অসুখে পড়লেন। কবিরাজ পরামর্শ দিলেন যে, বাদশাহ যদি রাজস্থানের বালিতে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর শরীর ঠিক হয়ে যাবে। বালিতে শরীর নিরোগ করার শক্তি থাকে। অতএব বাদশাহকে রাজস্থানে পাঠিয়ে দাও।

'রাজস্থানে পাঠাবার কী প্রয়োজন ? ওখান থেকে বালি এখানে নিয়ে এলেই তো হয় !'

'ঠিক কথা। বালি নিয়ে আসার জন্য তাহলে উট পাঠাও।'

'উট পাঠানোর কী দরকার ? এখানে বাজারেই বালি পাওয়া যায়।'

'বাজারে কি করে পাবে ?'

'আরে, এ হল দিল্লীর বাজার, এখানে সব পাওয়া যায়। আমি এক জায়গায় বালির পাহাড় দেখেছি।'

'তাই নাকি ? তাহলে শিগ্‌গির বালি আনিয়ে নাও।'

বাদশাহের লোক ভবঘুরের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল বালির কি দর ? ভবঘুরে বলল, 'মাটিই নাও অথবা বালি, দুই-ই এক দাম। কেননা বলদের পিঠে দুটিই একভাবে এসেছে।' বাদশাহের লোকেরা সমস্ত বালি কিনে নিয়ে গেল। ভবঘুরে যদি দিল্লী ফেরৎ সেই ভদ্রলোকের কথা শুনতো, তাহলে এই টাকা সে কী পেত ? এতেই প্রমাণিত হয় যে সেই সরদারের বুদ্ধিই ঠিক ছিল।

এই গল্পটি থেকে এই শিক্ষাই নেওয়া উচিত যে, যিনি নিজে প্রকৃত উন্নতি

করেছেন, যাঁর বুদ্ধি বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে, যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করেছেন, যিনি তাঁর দুঃখ, শোক, অশান্তি ইত্যাদি দূর করেছেন, সেই সাধু-মহাত্মাদের কথা মেনে চলা উচিত ; কারণ তাঁদের বুদ্ধিই ঠিকমতো বিকশিত হয়েছে। যেমন, কেউ যদি ব্যবসায়ে অনেক টাকা রোজগার করে থাকে, তাহলে সে যেমন বলে, তেমনই আমরা করলে, আমাদেরও লাভ হতে পারে। তার লাভ হলে আমাদের কেন হবে না ? তেমনই সাধু-মহাত্মাদের কথা শুনলে অবশ্যই আমাদের ভালো হবে। তাঁদের কথা ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও মেনে নেওয়া উচিত। আমরা নিজেদের বুদ্ধিতে যে সাধন-ভজন করেছি তাতে আজ পর্যন্ত কতখানি অগ্রগতি হয়েছে ? আমাদের বুদ্ধিতে কত উন্নতি করতে পেরেছি ?

—— ০ ——

বাসি খাবার

একটি ছেলে ছিল। মা তার বিবাহ দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেটি কোন কাজ করত না। মা যখনই তাকে খেতে দিত, তখনই বলত, 'বাবা বাসি ভাত খাও।' ছেলেটি বুঝতে পারত না যে মা কেন এমন কথা বলেন। তুবও সে কিছু বলতা না। একদিন মা কোন কাজে বাইরে গেছে, যাবার সময় বউমাকে (ছেলের বউকে) বলে গেল যে ছেলে এলে তাকে খেতে দিতে আর খেতে দিয়ে বলতে হবে যে বাসি ভাত খেয়ে নাও। বউটি তার স্বামীকে খেতে দিয়ে তাই বলল, তাতে ছেলেটি রেগে গেল, আরে মা তো একথা বলেই থাকে আর এ-ও শিখে গেছে ! সে তখন তার স্ত্রীকে বলল, 'বলতো, ভাত ঠাণ্ডা কোথায় ? ভাত তো গরম আর ডাল তরকারী সবই গরম, তাহলে তুমি বাসি ভাত বলছ কেন ?' তার স্ত্রী বলল, 'সে কথা তোমার মা জানেন। তোমার মা-ই আমাকে এই কথা বলতে বলেছেন, তাই আমি বলেছি।' ছেলেটি বলল 'আমি কিছু খাব না। মা বলেন বলে তুমিও সেই কথা শিখে নিয়েছ !'

মা বাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ছেলে খেয়েছে ?' বউটি উত্তর দিল, 'উনি তো খানই নি, উল্টে রেগে গেছেন।' মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতে ছেলে বলল, 'মা তুমি রোজ রোজ বল যে বাসি ভাত খেয়ে নাও, আমি সে কথা মেনে নিই, এখন আমার বউও তাই বলতে শিখে গিয়েছে।

খাবার তো গরমই, তুমি বল, ভাত বাসি কি করে হয় ?' মা জিজ্ঞাসা করল, 'বাসি ভাত কাকে বলে ?' ছেলেটি বলল—'সকালের তৈরি খাবার সন্ধ্যায় বাসি, ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তেমনই আগের দিনের তৈরি করা খাবার পরের দিন বাসি হয়ে যায়। বাসি ভাত ঠাণ্ডা আর এখনই রান্না করা ভাত গরম হয়।' মা বলল—'বাবা, এবার তুমি চিন্তা করে দেখ। তোমার বাবার যে রোজগার, তা ঠাণ্ডা এবং বাসি ভাতের মতো। গরম আর তাজা খাবার তখনই হবে, যখন তুমি নিজে উপার্জন করে আনবে।' ছেলে তখন সব বুঝতে পেরে মাকে বলল—'ঠিক আছে মা, এবার থেকে আমি নিজে উপার্জন করে গরম (তাজা) খাবার খাব !'

এই গল্পটি থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে বিবাহের পরে বাসি ভাত খাওয়া উচিত নয়, নিজ উপার্জনের খাবার খাওয়া উচিত। যখন ভগবান রাম বনবাসে গিয়েছিলেন, সেইসময় রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিল। রামায়ণের কোথাও একথা শোনা যায়নি যে রাম ভরতকে খবর পাঠিয়েছেন যে রাবণ আমার স্ত্রীকে হরণ করেছে, তুমি আমাকে সাহায্য করো। কারণ রাম জানতেন যে বিবাহ করলে স্ত্রীকে রক্ষা করা ও পালন করা স্বামীর কর্তব্য। তিনি প্রথমে নিজ বাহুবলে সুগ্রীবকে সাহায্য করেন, পরে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। রাম সুগ্রীবকে রাজ্য, অর্থ, নগরী এবং স্ত্রী—এই চারটি বস্তু পাইয়ে দিয়ে তবে তাঁর স্ত্রীর জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন। তাই বিবাহ করা তখনই উচিত, যখন স্ত্রী ও সন্তানদের পালন-পোষণ করার ক্ষমতা হবে। এই ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা কখনোই উচিত নয়।

——— ০ ———

সাধু-সন্তের শরণাগতি

এক গ্রামে এক রাজপুত ছিল। তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একটি ছেলে ছাড়া আর কেউ বেঁচে ছিল না। সে সেই রাজপুতের বাড়িতে কাজ করতে লাগল। প্রত্যেক দিন ভোরে সে গোরু বাছুর চরাতে যেত আর ফিরে এসে খাবার খেত। এইভাবে দিন কাটছিল। একদিন দুপুরে সে গোরু চরিয়ে ফিরে এলে রাজপুতের পরিচারিকা তাকে ঠাণ্ডা রুটি খেতে দিল। তখন ছেলেটি

বলল 'একটু দই বা ঘোল পেলে ভালো হত।' পরিচারিকা বলল—'যা-যা তোর জন্য আবার ঘোল তৈরি করব ! যা, এমনিই খেয়ে নে, না খেলে তোর যা ইচ্ছা কর।' সেই ছেলেটির তখন খুব রাগ হলো, সে ভাবল যে আমি এত রোদে গোরু চরিয়ে এলাম, ক্ষিধে পেয়েছে, আর আমাকে শুক্‌নো ঠাণ্ডা রুটি দিয়ে দিল, একটু ঘোল চাইলাম তো মুখ ঝাম্‌টা দিল ! সে ক্ষিধে নিয়েই সেখান থেকে চলে গেল। গ্রামের কাছেই একটি শহর ছিল। সেই শহরে একটি সাধুদের দল এসেছিল। ছেলেটি সেইখানে চলে গেল। সাধুরা তাকে খেতে দিল আর জিজ্ঞাসা করল—'তোমার সংসারে কে কে আছে ?' সে বলল, 'কেউ নেই।' তখন সাধুরা বলল—'তুমি সাধু হয়ে যাও।' ছেলেটি সাধু হয়ে গেল। পরে সে পড়াশোনা করার জন্য কাশী গেল। সেখানে লেখাপড়া শিখে খুব বিদ্বান হলো। কয়েক বছর পরে সে মণ্ডলেশ্বর (মোহন্ত) নির্বাচিত হল। মণ্ডলেশ্বর হবার পরে একদিন তার সেই পুরানো শহর থেকে নিমন্ত্রণ এলো। সেই সাধুটি তখন নিজের মণ্ডলীর সাধুদের নিয়ে সেখানে এলেন। যে রাজপুতের কাছে তিনি আগে কাজ করতেন, সেই রাজপুত বৃদ্ধ হয়েছিলো। সেই রাজপুত তাঁর কাছে এসে সৎসঙ্গ করলেন এবং প্রার্থনা জানালেন—'মহারাজ ! একবার আমার কুটিরে পদার্পণ করুন, যাতে আমার কুটির পবিত্র হয়।' মণ্ডলেশ্বর সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

মণ্ডলেশ্বর তাঁর মণ্ডলীর সাধুদের নিয়ে রাজপুতের গৃহে গেলেন। খাবার সময় হলে পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা হলো এবং সকলে মিলে খেতে বসলেন। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করা হলো এবং তারপরে সকলে খেতে শুরু করলেন। মহারাজের সামনে নানাপ্রকার সুখাদ্য থরে থরে সাজানো ছিল। সেই রাজপুত মণ্ডলেশ্বর মহারাজের কাছে এলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচারক হাতে হালুয়ার পাত্র নিয়ে এলো। রাজপুতও মহারাজকে অনুরোধ করতে লাগলেন যাতে তিনি অন্ততঃ একটু হালুয়া তাঁর হাত থেকে নেন। মহারাজ তাইতে হেসে ফেললেন। তাঁর হাসি দেখে রাজপুত আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি হাসছেন কেন ?' মহারাজ বললেন, 'আমার একটা পুরানো কথা মনে পড়ে হাসি পেল।' রাজপুত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কথা, আমাকে বলুন !' মহারাজ তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ওহে, তোমরা একটু অপেক্ষা করো, বসো, জমিদার একটি পুরানো কথা জানতে

চাইছেন, তাই বলি শোনো।' মহারাজ রাজপুতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জ্ঞাতির একজন আপনার সঙ্গে থাকত, সেই পরিবারের কেউ আছে কি ?' রাজপুত বললেন, 'একটি ছেলে শুধু ছিল, সে কিছুদিন গোরু চরাত, তারপর কি জানি কোথায় চলে গেল ! অনেকদিন হয়ে গেল, আর সে ফিরে এলো না।' মহারাজ বললেন, 'আমিই সেই ছেলে ! কাছেই এক সাধুমণ্ডল এসেছিলো, আমি সেখানেই গিয়েছিলাম। পরে কাশী চলে যাই, সেখানে লেখাপড়া শিখে পরে মণ্ডলেশ্বর হয়েছি। এই সেই দালান, এখানেই একদিন আপনার বাড়ির পরিচারিকা আমাকে সামান্য একটু ঘোল দিতে আপত্তি করেছিল। আজ সেই আমিই আর এই সেই দালান, আপনিও সেই একই ব্যক্তি, যিনি নিজের হাতে আমাকে মোহনভোগ দিয়ে বলছেন যে দয়া করে আমি যেন আপনার হাত থেকে একটু মোহন ভোগ খাই !'

চাইলে পাওয়া যায় না ঘোল, তবু হলাম আমি ধন্য।
গলায় বাধে মোহন ভোগ এতো সাধু সঙ্গের পুণ্য॥

সাধুদের শরণ গ্রহণ করলে এমনই হয় যে, যেখানে সামান্য ঘোল পাওয়া যায় না, সেখানে মোহন ভোগও গলায় আটকে যায়। যদি কেউ ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি সাধুদেরও বরণীয় হয়ে ওঠেন। লক্ষপতি বা কোটিপতি হলে নয়, ভগবানের শরণাগত হলে, ভগবানের ভক্ত হলে তবেই স্বাধীন হওয়া যায় এবং তা একমাত্র মনুষ্যজন্মেই সম্ভব।

—— ০ ——

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় ?

এক ব্রাহ্মণ কাশীতে পড়তে গিয়েছিলেন। একদিন মাথায় বই নিয়ে শহরে যান ; হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ে। সঙ্গে ছাতা ছিল না। তাই একটি বাড়ির দরজার পাশে জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই বাড়িতে এক বারবণিতা বাস করত। কয়েকজন লোক 'হরিবোল' ধ্বনি তুলে একটি মৃতদেহ নিয়ে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। সেই বারবণিতা গলা তুলে একটি মেয়েকে বলল— 'যা, জিজ্ঞেস করে আয় যে, এই ব্যক্তি স্বর্গে গেল না নরকে ?' মেয়েটি চলে গেল। সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কথাটি শুনে দাঁড়িয়ে রইলেন , ভাবলেন এ আবার

কেমন বিদ্যা, যার দ্বারা মৃত্যুপথযাত্রীরা কোথায় যাচ্ছে জানা যায় ? কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি ফিরে এসে জানাল যে লোকটি নরকে গেছে। এরমধ্যে আর একটি মৃতদেহ গেল এবং বারবণিতা মেয়েটিকে আবার পাঠাল। এবার মেয়েটি এসে জানাল যে এই লোকটি স্বর্গে গেল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবতে লাগলেন যে আমি এতোদিন কাশীতে পড়াশোনা করেছি, কিন্তু আমি তো জানতে পারি নি যে মানুষ মৃত্যুর পরে কোথায় যায় ? আমাকে তো এই বিদ্যা শিখতে হবে।

ব্রাহ্মণ তখন বাড়ির ভিতরে গেলেন। বারবণিতা তাঁকে দেখে বুঝতে পারলো যে এই ব্রাহ্মণ তার গুণগ্রাহী নয়। তাই সে জিজ্ঞসা করল, 'আপনার এখানে কি দরকার ?' ব্রাহ্মণ বললেন—'মা ! আমি ....।' বারবণিতা বলল—'আমাকে মা বোলো না, আমি একজন বারবণিতা।' ব্রাহ্মণ বললেন—'আমার কাছে তুমি মা, বোন অথবা মেয়ের মতোই।' বারবণিতা জিজ্ঞাসা করল—'ব্যাপার কি ?' ব্রাহ্মণ বললেন—'তুমি একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালে যে মৃত লোকটি কোথায় গেল তখন সে এসে জানাল যে একজন নরকে গেল আর অন্যজন স্বর্গে গেল, এ কোন বিদ্যা ? আমি সেই বিদ্যাটি জানতে চাই।' বারবণিতা তখন মেয়েটিকে ডেকে বলল—'এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বল যে তুমি কী করে জানলে যে একজন নরকে গেল আর অন্যজন স্বর্গে!' মেয়েটি বলতে লাগল—'মহাশয় ! এরা যখন মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, একে কোথা থেকে আনলে, কোন পাড়া থেকে ?' তারপর আমি খোঁজ করে সেই পাড়ায় গিয়ে দেখি যে একটি বাড়িতে খুব কান্নাকাটি হচ্ছে, তখন বুঝলাম সেই বাড়ির লোকই মারা গেছে। তাদের প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে শুনলাম তারা বলাবলি করছে যে বাবা লোকটা মরেছে না বেঁচেছি। সকলের কাছে লাগালাগি করত, চুরি করত, মারামারি লাগাত, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে লোককে ফাঁসাত, লোকেদের বহু কষ্ট দিত। মরে গেছে ভালো হয়েছে, ঝামেলা গেছে। এই সব কথা কয়েকটি ঘরে বলতে শুনেছি, তাই এসে বললাম যে ওই লোকটি নরকে গেছে। দ্বিতীয় মৃতদেহটি দেখে তার খবর নিতে আমি তার পাড়ায় গেলাম। সেখানকার লোকেরা বলাবলি করছে 'হায় হায় ! কী দুঃখজনক কাণ্ড হলো, এই ব্যক্তি আমাদের পাড়ার আলো ছিল। সাধু-সন্তদের নিয়ে আসর বসাত,

সৎসঙ্গ করত, কারো অসুখ করলে রাত জাগত, কারো কোনো বিপদ আপদ হলে এই ব্যক্তি মন-প্রাণ, টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করত। এই ব্যক্তি মারা যাওয়ায় আমাদের পাড়া অন্ধকার হয়ে গেল। এই কথা শুনে আমি এসে বললাম যে এই লোকটি স্বর্গে গেছে।'

ব্রাহ্মণ তখন বললেন—আরে তাইতো ! আমাদের বইতেও একথা লেখা আছে যে, ভালো কাজ যারা করে তাদের সদ্‌গতি হয় আর খারাপ কাজ করলে তাদের দুর্গতি হয়।

———— o ————

এক ফুঁয়ের দুনিয়া

একজন মস্ত বড় সংসার-ত্যাগী সাধু ছিলেন। তাঁর একজন শিষ্য ছিল। সেই শিষ্য অত্যন্ত বিদ্বান এবং বহু পড়াশোনা করা। শিষ্যটি নানা গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতেন। অনেক লোক তাঁর কাছে তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনতে আসত। সাধুজী তাঁকে বোঝাতেন যে তত্ত্বব্যাখ্যা করা তেমন বড় কাজ নয়, এতে যেন সে আবদ্ধ হয়ে না পড়ে। শিষ্যটি তাঁর কথা না শুনে অন্যত্র গিয়ে তত্ত্বব্যাখ্যা করতে শুরু করল। সকলেই সেখানে যেতে লাগল। ব্যাখ্যা শোনার জন্য বহু ধনীব্যক্তি এবং রাজা স্বয়ং সেখানে আসতে লাগলেন। সাধুর এইসব শুনে মনে দয়া হল, তিনি ভাবলেন আমার শিষ্য এতেই বদ্ধ হয়ে থাকবে।

একদিন সাধুজী তাঁর শিষ্যের কাছে গেলেন। শিষ্য গুরু মহারাজকে দেখে খুশি হয়ে বলল—কি আনন্দ ! আমার গুরু মহারাজ আজ পদার্পণ করেছেন। সকলে শুনে একত্র হয়ে তাঁকে দেখতে এলো। গুরুকে সকলে খুব সম্মান জানাল, প্রশংসা করল, তত্ত্ব ব্যাখ্যাকারী মহারাজের গুরু বলে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করা হল। বড় সভার আয়োজন করা হল। রাজাও সেখানে এলেন। গুরুজীর কি মনে হোল, তিনি গিয়ে রাজার কাছে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি 'ভোঁ.......ও' করে অপান বায়ু ত্যাগ করলেন। লোকে দেখল যে গুরুর মধ্যে তো তেমন বিশেষ কিছু নেই, শিষ্যের মধ্যে যেমন বৈশিষ্ট্য আছে ! লোকে তাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হল, রাজাও অসন্তুষ্ট হলেন। গুরুজী জানালেন তিনি আজই এখান থেকে চলে যাবেন। লোকে শুনে খুশী হল যে ভালো কথা, বাবাঃ ঝামেলা গেল ! 'তত্ত্বব্যাখ্যাকারীর গুরু'—তাই তাঁকে

একটু সম্মান করা উচিত—এই মনে করে ভদ্রতার জন্য বহুলোক তাঁকে গাড়িতে তুলতে এল। সেখানে একটি পাখি মরে পড়েছিল। গুরুজী তাই দেখে পাখিটিকে আঙ্গুলে করে তুলে নিলেন আর সকলকে দেখাতে লাগলেন। সকলে তাকিয়ে দেখতে লাগল যে গুরুজী ! কী করছেন ? এবার গুরুজী পাখিটিতে একটি ফুঁ দিলেন, আর পাখিটি অমনি 'ফুর-র-র' করে উড়ে গেল। দেখে সকলে 'বাঃ বাঃ' করে উঠল, 'আরে ইনি তো খুব বড় সিদ্ধ পুরুষ !' চতুর্দিকে তাঁর জয় জয়কার হতে লাগল।

গুরুজী তখন তাঁর শিষ্যকে কাছে ডেকে বললেন—'তুমি কিছু বুঝতে পারলে ?' শিষ্য বললেন—'বোঝার কি আছে মহারাজ !' গুরুজী বললেন—'এই দুনিয়ার কী দাম তা কি তুমি বুঝেছ ? দুনিয়ার সবই একটি ফুঁয়ের ওপর নির্ভর করে। এক ফুঁয়ে পালিয়ে যায় আর এক ফুঁয়ে ফিরে আসে ! ফুঁয়ের কী সম্মান, কী দাম ! এতে কোনো তত্ত্ব নেই।' সুতরাং মান-মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টায় আবদ্ধ না হয়ে ভগবানের ভজনা করো। উচ্চ আসনে বসলে, তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করলে কেউ বড়ো হয় না।

——— ০ ———

চার সাধু আর এক চোর

চার সাধু ছিলেন। তাঁরা শহরের কাছে এক জঙ্গলে বসবাস করতেন এবং ভগবানের নাম জপ করতেন। চারজন সাধুরই পৃথক ভাবনা চিন্তা ও নিষ্ঠা ছিল। একদিন সেখানকার রাজা তাঁর পত্নীকে বললেন যে 'আমি আমার ছেলেকে একজন ভালো সাধু তৈরী করব, তাপর সে যদি রাজ্য চালাতে চায় চালাবে বা সাধু হতে চায় হবে।' রাণী বললেন—'মহারাজ ! যে সাধু হতে চায়, সে-ই সাধু হয়, অন্যের ইচ্ছায় কীভাবে হবে ? আপনার আর আমার উদ্যোগ কি সফল হবে ?' রাজা বললেন—'তার উপায় হল—সৎসঙ্গ !' **'সঠ সুধরহিঁ সতসংগতি পাঈ। পারস পরস কুঘাত সহাঈ॥'** (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ৩।৫)। রাণী বললেন—'এমন কোন ভালো সাধু কি আছেন, যাঁর কাছে ছেলেকে পাঠাবে ?' রাজা বললেন, যে 'কাছেই জঙ্গলে চারজন ভালো সাধু থাকেন। তাঁদের কাছে ছেলেকে পাঠিয়ে দেব।'

রাজা রাণী কথাবার্তা বলছিলেন। তখন রাত্রিকাল। দৈবাৎ সেইসময়ে এক চোর চুরি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। সে লুকিয়ে থেকে রাজা-রাণীর কথা শুনছিল। সে মনে মনে ভাবল যে 'আমি যদি চুরি করি তাহলে ধরা পড়ে যেতে পারি। কিন্তু যদি সাধু হয়ে যাই তাহলে কার্যসিদ্ধি হবে। রাজকুমার এসে আমার যদি শিষ্য হয়ে যায়, তাহলে আর চুরি করার দরকার কি ?'

চোর এই ভেবে গেরুয়া কাপড় পরে জঙ্গলে চলে গেল। সে বনে গিয়ে ভাবল যে 'এবার আমায় যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে, আমি তাদের কি উপদেশ দেব ?' এইসব ভেবে সেই চোরটি চারজন সাধুর মধ্যে একজন সাধুর কাছে গেল এবং তাঁকে জিজ্ঞসা করল—'মহারাজ ! কীকরে কল্যাণ হয় ?' সাধু বললেন—'বাবা, কারোকে দুঃখ দিও না, কারো মনে আঘাত দিও না, হৃদয়ে আঘাত কোরো না, কারণ এই হৃদয় ভগবানের বস্তু।' চোর জিজ্ঞাসা করল—'আর কি মহারাজ !' সাধু বললেন—'আর কিছু প্রয়োজন নেই, এই একটিতেই কার্যসিদ্ধ হবে।' চোরটি তখন দ্বিতীয় সাধুর কাছে গেল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—'মহারাজ ! আমি আমার কল্যাণ চাই, আপনি আমাকে তার উপায় বলে দিন।' সাধু বললেন—'কখনও কোনও কিছুর জন্যই মিথ্যা কথা বলবে না, সদা সত্য কথা বলবে, তাতে যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলেও। যেমন দেখবে, যেমন শুনবে এবং যেমন বুঝবে ঠিক তেমনই বলবে—

সাঁচ বরাবর তপ নহীঁ, ঝূঠ বরাবর পাপ।
জাকে হিরদৈ সাঁচ হৈ, তাকে হিরদৈ আপ॥'

চোর জিজ্ঞাসা করল—'আর কিছু ?' সাধু বললেন—'আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।' চোর এবার তৃতীয় সাধুর কাছে গেল এবং বলল—'মহারাজ ! আমার কল্যাণ হবে কীকরে ?' সাধু বললেন—খুবই সহজ ব্যাপার, দিন-রাত রাম নাম করো—

জুগতি বতায়ো 'জালজী', রাম মিলন কী বাত।
মিল জাসী ও 'মালজী' রাম রটো দিন রাত॥

চোর জিজ্ঞাসা করল—'আর কোনো উপায় আছে কি ?' সাধু জানালেন যে আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সে এবার চতুর্থ সাধুর কাছে গেল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—'মহারাজ কী করলে কল্যাণ হয় ?' সাধু

বললেন—'বাবা ! ভগবানের শরণ গ্রহণ করো। মনে যেন এই ভাব দৃঢ় ভাবে থাকে যে আমি একমাত্র ভগবানের। বিবাহের পরে যেমন নারীর মনে এই ভাব দৃঢ় হয় যে আমি কুমারী নই, আমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনই মনে এই ভাব দৃঢ় হয়ে যাক যে আমি ভগবানের হয়ে গিয়েছি, এখন আমি আর কারোরই হতে পারি না'—**'মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ।'** চোর জিজ্ঞাসা করল—'আর কোনো কিছু ?' সাধু বললেন—'আর কিছুর দরকার নেই, এই যথেষ্ট।'

চোরটি চারজন সাধুর কাছে থেকে চারটি উপদেশ শিখে নিয়ে কিছুদূরে গিয়ে ধ্যানে বসল। কিছুদিন পরে রাজা এলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে চারজন সাধুর কাছে গেলেন। সাধুরা চোরকে যা বলেছিলেন, সেইরকমই এক একজন এক একপ্রকার উপদেশ দিলেন। রাজা দেখলেন কিছুদূরে আর একজন সাধু বসে আছেন। রাজা তখন সেই পঞ্চম সাধু অর্থাৎ চোরটির কাছে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন, 'মহারাজ ! কৃপা করে কল্যাণের কথা কিছু বলুন।' সাধুবেশধারী সেই চোর চুপ করে ধ্যানমগ্ন হয়েছিল, কোনো কথা বলছিল না। রাজা অনেকবার অনুরোধ করায় সে বলল, 'আমি যা বলব তাই করবে তো ?' রাজা বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ ! তাই করব।' তখন সেই চোর বলল, 'কারুকে দুঃখ দিও না।' রাজা বললেন—'আর কিছু ?' সে বলল, 'সদা সত্য কথা বলবে।' রাজা বললেন—'আর কিছু ?' চোর বলল, 'ভগবদ্ নাম জপ করো।' রাজা বললেন—'আরও কিছু বলুন।' সে বলল, 'ভগবানের শরণাগত হও।' রাজা বললেন—'মহারাজ, আর কোন কথা ?' তখন সে বলল—'সাধু যেমন যেমন বলেন, তেমন কাজ করো।' রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন যে, এই সাধু আরও উচ্চভাব সম্পন্ন ! অন্য সাধুরা এক একজন এক একটি করে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু ইনি একাই পাঁচটি উপদেশ দিয়েছেন। রাজা অত্যন্ত সহজ সরল ছিলেন। তিনি জানতেন না যে এইভাবে সাধুদের চেনা যায় না। রাজা তাঁর প্রাসাদে ফিরে এলেন।

রাত্রিবেলা চোরটি আবার লুকিয়ে রাজপ্রাসাদে এলো। রাজা যখন রাণীর মহলে গেলেন, চোরটিও তখন দরজার পিছনে লুকিয়ে থেকে তাঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। রাণী জিজ্ঞাসা করলেন কি কথা হল। রাজা তাঁকে জানালেন যে তিনি জঙ্গলে গিয়ে সাধুদের দর্শন করে এসেছেন। 'আমি

ভেবেছিলাম ওখানে চারজন সাধু থাকেন, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলাম ওখানে পাঁচজন সাধু বসেন', রাজা বললেন। রাণী জিজ্ঞাসা করলেন—'সেখানে গিয়ে আপনি কি বললেন ?' রাজা বললেন—'আমি ভগবদ্প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তাতে তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, কারোকে দুঃখ দিও না। দ্বিতীয়জন বললেন, সদা সত্য কথা বলবে, তৃতীয়জন নাম জপ করতে বললেন, চতুর্থজন বললেন ভগবানের শরণাগত হতে। কিন্তু পঞ্চম সাধুটি ঐ চার সাধুর চারটি উপদেশের অতিরিক্ত পঞ্চম আর একটি উপদেশ দিয়েছেন, বলেছেন যে সাধুদের নির্দেশ পালন করো।' রাজা ও রাণী দুজনেই অত্যন্ত সরল এবং সহজ স্বভাবের ছিলেন। তাঁরা চিন্তা করে দেখলেন যে ঐ পঞ্চম সাধুটিই ঠিক, ওঁর কাছেই তাঁরা তাঁদের পুত্রকে পাঠাবেন। তাঁদের কথায় চোরের মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হল। সে ভাবল 'আরে ! আমি তো সব কৃত্রিম কথা বলেছি ! তাতেই রাজা এতো মুগ্ধ হয়েছেন ? যদি সত্যি কথা বলি তবে তা কতো ভালো হয় ?' রাজার সৎ স্বভাবের জন্য চোরের হৃদয় পরিবর্তিত হল। সে সত্য সত্যই সাধু হয়ে জঙ্গলে চলে গেল। সে মনে মনে চিন্তা করল যে চারজন সাধুর চারটি উপদেশ আমি তো মেনে চলবই, উপরন্তু পঞ্চম উপদেশও আমি তখনই পালন করব যখন আমি কোনো সৎ সাধুর সন্ধান পাব। ভগবদ্প্রাপ্ত এমন কোনো সাধু যদি পাই তবে আমি তাঁর নির্দেশ পালন করব। সে সেই রূপ সাধুর সন্ধানে ব্যাপৃত হল।

প্রথম জীবনে চোর হওয়ায় সে ধূর্ত ছিল, তাই নানা প্রকার সাধুর ওপরে তার বিশ্বাস ছিল না। সে কয়েকজন সাধুর কাছে গেল কিন্তু কাউকেই তার মনে ধরল না। ভালো সাধু পাবার জন্য তার মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে ভাবল যে যাঁতে আমার চিত্ত আকর্ষিত হয়, বিশ্বাস আসে, তাঁকেই আমি গুরুরূপে বরণ করব। ভগবান তার এই সত্যকার নিষ্ঠা দেখে নিজেই সাধুরূপে তার সামনে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে দেখেই চোরটির মনে এক বিশেষ প্রভাব পড়ল এবং সে বলল—'মহারাজ ! আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে দীক্ষা দিন। আপনি আমাকে যা বলবেন, আমি তা-ই করব।' সাধুরূপী ভগবান বললেন—'আমি যা বলব তা-ই করবে ? সত্য বলছ তো ?' সে বলল—'হ্যাঁ, মহারাজ আমি সত্যকথা বলছি।' ভগবান বললেন—'তাহলে প্রথমে একটা কাজ করো, তারপর তোমাকে মন্ত্র দেব। তুমি এক কাজ কর, যে ব্যক্তি

কারো মনে দুঃখ দেয় না, তার মাথা কেটে আনো, আর যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে, তার মাথা কেটে আনো, আর যে ব্যক্তি নাম জপ করে তার মাথাও কেটে আনো এবং যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছে তারও মাথা কেটে আনো। এই চারটি মাথা কেটে আনলে পরে আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।'

চোরটি ভাবল আরে ! এ তো খুব সহজ কাজ। এই চারজনই তো এক জায়গায় বসে আছে। সে তরবারী নিয়ে ছুটতে ছুটতে গেল। কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতে তার মনে হল, আমি তো ঠিক করেছি যে কারো মনে দুঃখ দেব না, কিন্তু দুঃখ দেওয়া তো পরের কথা, আমি গলা কাটতেই যাচ্ছিলাম ! সে ভেবে দেখল যে একাজ তার পক্ষে করা কখনোই সম্ভব নয়। তার মনে সৎবুদ্ধির উদয় হয়েছিল। সে আবার দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এলো।

ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হল, এনেছ ?' সে বলল—'হ্যাঁ, এনেছি।' ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—'কোথায় ?' সে উত্তর দিল—'আমার একটি মাথাতেই চারটি বস্তু আছে। আমি কখনও কারো মনে দুঃখ দিই না, সর্বদা সত্য কথা বলি, নাম-জপ করি এবং ভগবানের শরণাগত। এই চার বস্তুই আমার মধ্যে আছে ; সুতরাং আমি আমার মাথা কেটেই আপনাকে সমর্পণ করছি।'

তখন ভগবান বললেন—'আচ্ছা, এখন আর মাথা কাটার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে দীক্ষা দিচ্ছি !' ভগবান তাকে দীক্ষা দিলেন এবং সে একজন সত্যকার সাধু হয়ে গেল।

এইভাবে চালাকির দ্বারা পাঁচটি উপদেশ ধারণ করলেও চোর ভগবানকে লাভ করেছিল এবং সাধু হয়ে গিয়েছিল। যদি কেউ সত্য সত্যই হৃদয় দিয়ে এই পাঁচটি উপদেশ পালন করে, তাহলে তার অন্য কিছু করার প্রয়োজন হয় না। তার ঈশ্বর লাভ হবেই।

সং অনুযায়ী আচরণ

এক রাজা ছিলেন। তাঁর কাছে একজন বহুরূপী আসত। সে নানাপ্রকারে বেশ ধারণ করে সং সাজত। তার মধ্যে ভগবতীর এমন শক্তি ছিল যে সে যে

রূপই ধারণ করত, তা সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠত। তাতে কোনোপ্রকার ভুল-ত্রুটি হোত না।

রাজা একদিন বললেন—'তুমি একজন সংসার বিমুখ, ত্যাগী মহাত্মার বেশ ধারণ করো।' বহুরূপী তা মেনে নিল এবং কিছুদিন সে অন্যত্র গুপ্ত হয়ে থাকল। যখন তার দাড়ি-গোঁফ বেশ বেড়ে উঠল তখন সে সাধুর বেশ ধারণ করে শহরে এলো। সে সকলের সঙ্গেই সাধুর মতো আচরণ করতো। কারো ওপরেই রাগ বা ঈর্ষা করত না। ভিক্ষা করে যা পেত, তাতেই সন্তুষ্ট থাকত। লোকেদের খুব ভালো ভালো কথা বলত। শহরে সবাই জেনে গেল যে একজন সংসারবিমুখ ত্যাগী মহাত্মা এসেছেন। রাজা মন্ত্রীকে পাঠালেন যে দেখে এসো এ সেই বহুরূপী না সত্য সত্যই কোনো সাধু ! মন্ত্রী গিয়ে তাকে দেখে চিনে ফেললেন যে এ সেই বহুরূপী। রাজা ঘোষণা করলেন যে তিনি সাধু দর্শনে যাবেন। রাজা একটি থালায় অনেক টাকা নিলেন আর পূজার জন্য নানা ফলমূল নিয়ে অত্যন্ত সাড়ম্বরে সাধু-দর্শনে গেলেন। মন্ত্রী এবং আরও অনেকে তাঁর সঙ্গে গেল। লোকে বলতে লাগল—দেখো এমন বড় সাধু যে স্বয়ং রাজা তাঁকে দর্শন করতে আসছেন ! রাজা সাধুর কাছে এসে কিছু না ছুঁয়ে 'শিব শিব' বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন। লোকে বলতে লাগল বেশ সুন্দর সাধু-সঙ্গ হচ্ছিল, কি জানি রাজা কি ভাবলেন, সাধুসঙ্গে বাধা দিলেন। রাজার ভেট দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল, ওসব সাধুর কোন প্রয়োজনে লাগল !

বহুরূপী পরে নিজের আসল রূপে রাজার কাছে এলো এবং বললো—'মহারাজ ! কিছু পুরস্কার যদি পাই।' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার কি মনে হয়, আমি তোমাকে সেই থালা ভর্তি টাকা পুরস্কার দেব ?' সে বলল—'আপনি খুশি হয়ে যা দেবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।' রাজা বললেন—'তুমি মূর্খ ! আমি কত টাকা নিয়ে গিয়ে তোমার সামনে রেখেছিলাম, কিন্তু তুমি তা নাওনি, ছেড়ে চলে গিয়েছিলে !' সে বলল—'মহারাজ ! আমি সাধুর বেশ ধারণ করেছিলাম, তাই আমি এমন কাজ কি করতে পারি যাতে সাধুর বেশে কোনো কালিমা লেগে যায় ! আমি যদি টাকা দেখে মুগ্ধ হতাম তাহলে আমার সাধুর সাজ নষ্ট হয়ে যেত এবং ভগবতী মাতা রুষ্ট হতেন।' রাজা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তাই তো, এতো ঠিক কথাই বলছে ! রাজা তখন

বহুরূপীকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন।

রাজা একদিন বহুরূপীকে বললেন—'তুমি সিংহের রূপ ধারণ করো।' সে বলল—'অন্নদাতা ! আমি যখন যে সং ধারণ করি, তাতে কোনো ত্রুটি থাকে না। সুতরাং আপনি আমাকে সিংহ সাজতে বলবেন না কারণ এই সং সাজা অত্যন্ত বিপজ্জনক।' রাজা বললেন—'কিন্তু আমি সিংহের সংই দেখতে চাই।' বহুরূপী বলল—'মহারাজ, যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাই আগে থেকে আমি আপনার কাছ থেকে সেই ক্ষতির জন্য মাফ চেয়ে রাখছি, তা নাহলে অন্য কোন রূপ ধারণ করার নির্দেশ দিন।' রাজা বললেন—'আমি আগে থেকেই তোমার সব অপরাধ মাফ করে দিচ্ছি, তুমি সিংহের রূপ ধারণ করো।' তখন বহুরূপী সিংহের চামড়া পরে সিংহের মতো সং সাজল। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এলো এবং সিংহের মতো বসল। রাজার ছেলে সেখানে খেলছিল। সে খেলা করতে করতে সেখানে এসে সিংহরূপী বহুরূপীকে দেখল, আর পিছন দিক থেকে তাকে একটি লাঠি দিয়ে মারল। সিংহ গর্জন করে উঠে লাফ দিয়ে রাজার ছেলেকে মেরে ফেলল ! রাজা খুব দুঃখ পেলেন যে এ কেমন সং, যে আমার ছেলেকে মেরে ফেলল ! পরের দিন বহুরূপী কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল—'মহারাজ ! আমায় আপনি ক্ষমা করুন ! আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম যে এরূপ ভয়ংকর সং আমাকে সাজতে বলবেন না। আমার শক্তি আমার ইষ্টমাতা প্রদত্ত। যদি ঠিকমতো সং না সাজি তাহলে মা অসন্তুষ্ট হন।' রাজা বললেন—'তোমার এই সং সাজায় আমার কত ক্ষতি হল বল, রাজকুমার মারা গেল !' কিন্তু আর কিই বা করবেন ! তিনি বাক্যবদ্ধ ছিলেন, কারণ বহুরূপী তো আগেই ক্ষমা চেয়ে রেখেছিল।

রাজার কাছে এক নাপিত থাকত। সে রাজাকে পরামর্শ দিল যে বহুরূপীকে সতীর সং হতে বলতে। সতী পতির সঙ্গে সহমরণে দগ্ধ হয়। এ যদি সতীর বেশ ধারণ করে তাহলে আগুনে পুড়ে মরে যাবে এবং রাজকুমারকে মারার সাজা আপনিই পেয়ে যাবে। আমাদের আর ওকে কোন সাজা দিতে হবে না।

রাজা তখন বহুরূপীকে ডেকে আনলেন আর বললেন—'তুমি সতীর সং ধারণ কর।' সে বলল—'ঠিক আছে অন্নদাতা ! আমি তাই সাজব।' শহরে এক বেওয়ারিশ শব পড়েছিল। বহুরূপী তাকে দেখে সতীর বেশ ধারণ করল।

নানাপ্রকার সাজগোজ করে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সে রাস্তা দিয়ে যেতে লাগল। পথে লোকে ভীড় করে দেখল একজন নারী সতী হতে যাচ্ছে। রাজার কাছে খবর গেলে রাজা মন্ত্রীকে বললেন খবর নিতে। মন্ত্রী খোঁজ নিয়ে দেখল যে এ সে-ই বহুরূপী। রাজা তখন লোক পাঠিয়ে দিলেন যাতে বহুরূপীকে ভালো করে পোড়ানো হয়, যেন বেঁচে না থাকে। নদীতীরে শ্মশান ঘাট। লোকে অনেক কাঠ নিয়ে এলো। সতীরূপী বহুরূপী তখন সেই শবকে কোলে নিয়ে চিতায় উঠে বসল। কাঠের চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হলে চিতা হু-হু করে জ্বলে উঠল। এই সময় হঠাৎ ভীষণ জোরে ঝড় উঠল এবং প্রবল বেগে বৃষ্টি। সেই ঝড় ও বৃষ্টির চোটে সব লোক পালিয়ে গেল। বাড়ির আত্মীয় কুটুম্ব হলে থাকত, কিন্তু এরা তো কেউ আত্মীয় নয় ! বৃষ্টির জন্য আগুন নিভে গেল আর নদীতে বান আসায় চিতার কাঠগুলি সব ভেসে গেল। বহুরূপী সেই কাঠ ধরে কোনোমতে সাঁতার কেটে তীরে এসে পৌঁছাল, দেবী মাতা তার ইষ্ট হওয়ায় সে প্রাণে বেঁচে গেল।

কয়েক মাস পরে সেই বহুরূপী রাজার কাছে এসে বলল, 'অন্নদাতা, কিছু পুরস্কার যদি পাই !' রাজা তাকে দেখে চমকে উঠে বললেন—'আরে ! তুমি ! তুমি না আগুনে পুড়ে মরে গিয়েছিলে ?' সে বলল—'মরেই গিয়েছিলাম, কিন্তু শক্তিমায়ের কৃপায় আবার ফিরে এসেছি।' রাজা বললেন—'তুমি আমার বাপ-ঠাকুর্দাদের সঙ্গে দেখা করেছ ?' সে বলল—'হ্যাঁ অন্নদাতা ! স্বর্গে সবার সঙ্গে দেখা করে এসেছি।' রাজা বললেন—'তাঁদের সব খবর কি ?' বহুরূপী বলল—'খবর সব ভালো, কিন্তু তাঁদের চুল-দাড়ি ও নখ খুব বেড়ে গেছে, তাই তাঁরা রাজপ্রাসাদ থেকে নাপিতকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।' রাজা বললেন—'নাপিত কীকরে সেখানে যাবে ?' বহুরূপী বলল—'যেমন করে আপনার বাবা-ঠাকুর্দারা সব গেছেন, আমি গেছি, তেমন করেই যাবে, কেননা যাবার তো একটাই পথ।' নাপিত শুনে ভাবল এবার আমার মৃত্যু এসেছে ! রাজা আদেশ দিলে আর কে আমায় রক্ষা করবে ? নাপিত তখন গিয়ে বহুরূপীর পায়ে পড়ল যে এবার তুমি কোনোভাবে আমাকে রক্ষা করো, আমার ঘর বরবাদ হয়ে যাবে। ঘরে আর কেউ উপার্জনকারী নেই। বহুরূপী বলল—'সতীর সং সাজার জন্য তুমিই রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলে না ? এবার তুমিও যাও।' নাপিত তখন তার খুব

হাতে পায়ে ধরতে লাগল, তখন বহুরূপী বলল—'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো শত্রুতা নেই।' সে রাজাকে গিয়ে বলল—'অন্নদাতা ! আমি আসলে মরিনি ! আমাকে পোড়াবার জন্য অনেক কাঠ জড়ো করা হয়েছিল। কাঠগুলি জ্বলতে জ্বলতে আমার দিকে আসছিল—তার আগেই হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। লোকেরা সব পালিয়ে গেল আর মায়ের কৃপায় আমি বেঁচে গেলাম। আমি সতীর সং সেজেছিলাম তাই আগুনে পুড়তে আমি ভয় পাইনি। আপনি যে সংয়ের বেশ ধারণ করতে বলবেন, আমি ঠিক তেমনই সাজব, তার কোন অন্যথা হবে না। পরে আপনি যে পুরস্কার দেবেন, খুশি হয়ে আমি তাই গ্রহণ করব।'

এর তাৎপর্য হল যে নিজের সং (অর্থাৎ আমরা জগতে যার সঙ্গে যেভাবে সম্পর্কযুক্ত সেই) অনুসারে নিজের নিজের কর্তব্য পালন করা অর্থাৎ বাবা, মা, ভাই, বোন, মেয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ী, গৃহবধূ—যে দায়িত্বে আমরা রয়েছি সেই অনুসারে নিজের নিজের কর্তব্য পালন করা। যে ঠিকভাবে নিজের কর্তব্য পালন করে, ঈশ্বর তাকে কৃপা করেন।

——— ○ ———

প্রাসাদ নির্মাণে ত্রুটি

এক রাজা ছিলেন। তিনি একজন সাধুর কাছে যাওয়া আসা করতেন এবং তাঁর সঙ্গে সৎসঙ্গ করতেন। সেই রাজা নিজের জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করলেন। আগেই তাঁর বেশ কয়েকটি প্রাসাদ ছিল। এবার যে প্রাসাদ তৈরি করালেন তাতে আরাম করার পুরো বন্দোবস্ত ছিল এবং সেখানে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজা সাধুকে তাঁর প্রাসাদ দেখতে আসার জন্য বললেন। তিনি বললেন সাধু তাঁর কুটিরে পদার্পণ করলে কুটির পবিত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু সাধু আর কিছুতেই তাঁর কথা রাখতে পারেন না। অনেক বার রাজা অনুরোধ করায় একদিন সাধু বললেন—আচ্ছা, তবে চলো যাই।

রাজা সাধুকে মহল দেখাতে আরম্ভ করলেন 'এটি আমার শোবার ঘর', 'এই আমার বিচার কক্ষ', 'এই হল খাবার ঘর', 'এটি স্নান করার ঘর' ইত্যাদি। সাধু চুপচাপ দেখে যাচ্ছিলেন, কোনো কথা বলছিলেন না। তিনি

যদি প্রশংসা করতেন, তাহলে তাতে হনন কার্য অনুমোদন করা হত। বাড়ি তৈরি করলে জীব-জন্তুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় ! অনেক জীব মারা পড়ে। ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি জন্তুর থাকা, চলা-ফেরায় বাধা পড়ে ; কারণ যে জায়গাতে বাড়ি তৈরি করা হয়, সেই জায়গাতে তারা আর যেতে পারে না, স্বাধীনভাবে বেড়াতে পারে না। আগে ওই স্থানটিতে সবার অধিকার ছিল, কিন্তু বাড়ি তৈরি করা হলে তাতে আর বাড়ির মালিক ছাড়া আর কারও সেখানে অধিকার থাকে না।

সাধু কোনো কথা না বলায় রাজা মনে করলেন সাধু মহারাজের প্রাসাদ পছন্দ হয়নি। রাজারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'মহারাজ ! প্রাসাদ তৈরিতে কোনো কিছুর ঘাটতি হয়েছে কি ?' সাধু বললেন—'এতে তো একটি মারাত্মক ঘাটতি থেকে গিয়েছে।'

রাজা চিন্তা করলেন যে বড় বড় কুশল কারিগর এই প্রাসাদ তৈরি করেছে। তারা এখানে কোথাও কিছুর অভাব রাখেনি। যেখানে যেটুকু অভাব ছিল, তার পূরণ করেছে। কিন্তু সাধুবাবা বলছেন অভাব আছে এবং তাও সাধারণ কিছু নয় অনেক বড় ত্রুটি রয়েছে। রাজা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন, বললেন—'অনেক বেশি কিছুর অভাব আছে কি ?' সাধু বললেন, 'হ্যাঁ, মারাত্মক ভুল হয়েছে।' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'মহারাজ ! কিসের ত্রুটি ?' সাধু বললেন—'এই যে দরজা এখানে রেখেছে, এটি কেন !' রাজা বললেন—'মহারাজ ! দরজা না থাকলে প্রাসাদের কি হবে ?' সাধু বললেন—'তুমি এই প্রাসাদ তৈরি করেছ কেন ?' রাজা বললেন—'আমি নিজে থাকার জন্য তৈরি করেছি।' সাধু বললেন—'রাজা, তুমি তো থাকার জন্য তৈরি করেছ, কিন্তু একদিন তো লোকে তোমাকে নিয়ে চলে যাবে। এর থেকে বড় ত্রুটি আর কি হবে, বলো ? তৈরি করেছ থাকার জন্য, কিন্তু লোকে তো থাকতে দেবে না, উঠিয়ে নিয়ে যাবে, তাই যদি থাকতে হয়, দরজার দরকার নেই, বাইরে বেরুবোর কোন রাস্তা রাখা উচিত নয়।'

অর্থাৎ ঘর-বাড়ি আমাদের আসল ঘর নয়। একদিন এসব ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমাদের আসল ঘর হল সেই, যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না—**'যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (গীতা ১৫।৬)।

——— o ———

হীরের দাম

একজন বুদ্ধিমান জহুরী ছিল। সে নিজের কাজে খুব দক্ষ ছিল। কিন্তু যুবক বয়সেই সে মারা যায়। মৃত্যুকালে সে তার স্ত্রী এবং বালক পুত্রকে রেখে যায়। লোকেরা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে ঠকিয়ে টাকাপয়সা আত্মসাৎ করে নেয়। বহু টাকা নষ্ট হয়ে যায়। জহুরীর কাছে একটি হীরে ছিল, জহুরী মৃত্যুকালে সেটি তার স্ত্রীকে দিয়ে যায়। সেই হীরে অত্যন্ত দামী ছিল। জহুরীর পুত্র যখন পনের-কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছাল তখন তার মা ছেলেকে বলল—'দেখো বাবা ! তোমার বাবা আমাকে এই হীরেটি দিয়েছিলেন। তিনি এর দাম বলে যাননি, শুধু বলেছিলেন এটি অমূল্য। কেউ যদি এর দাম নির্ধারণ করে, সেই দাম হিসাবে তার বুদ্ধির দাম নির্ধারিত হবে। হীরের মূল্য নয়, তার বুদ্ধির মূল্যই বোঝা যাবে। তুমি এই হীরেটি নিয়ে যাও আর এর দাম জেনে এসো, কিন্তু কোথাও এটি দিয়ে আসবে না।'

ছেলেটি হীরে নিয়ে বাজারে গেল। প্রথমে সে এক সব্জী বিক্রেতাকে গিয়ে হীরেটি দেখিয়ে তার দাম জিজ্ঞাসা করল। সব্জী বিক্রেতা বলল, 'আরে ! এটা বাচ্চাদের খেলার খুব সুন্দর জিনিস। তুমি এর বদলে দুটি মূলো নিয়ে যাও।' ছেলেটি বলল—'না, এটা আমি বেচব না।' আরো এগিয়ে সে কয়েকজনকে এর দাম জিজ্ঞাসা করলে, কেউ বলল 'দু-টাকা', কেউ বলল 'পাঁচ টাকা'। পরে এক স্বর্ণকারের কাছে সেটির মূল্য 'দশ' 'বিশ' করে 'পঞ্চাশ' টাকা পর্যন্ত উঠল। তারপরে সে গেল এক জহুরীর কাছে, জহুরী 'পাঁচশো' থেকে 'এক হাজার' পর্যন্ত দাম দিতে রাজী হয়ে গেল। ছেলেটি যেমন যেমন বড়ো হীরে ব্যবসায়ীর কাছে যেতে থাকল, তেমন হীরের দামও বাড়তে থাকল। সে হীরেটি নিয়ে একজন বড়ো জহুরীর কাছে গেলে সেই জহুরী এর দাম এক লাখ টাকা বললেন। ছেলেটি বড়ো আশ্চর্য হল হীরের দামের এই বৈচিত্র্য দেখে।

লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে ছেলেটি একজন বৃদ্ধ জহুরীর কাছে পৌঁছাল। সেই বৃদ্ধ একজন খুব বিশ্বস্ত এবং খাঁটি জহুরী ছিল। সে হীরেটি দেখে ছেলেটিকে বলল—'আরে ! এই হীরে তুমি কোথায় পেলে ?'

ছেলেটি বলল—'আমার বাবা দিয়েছিলেন।'

'তোমার বাবা কে ?'

'অমুক নামের হীরক ব্যবসায়ী ছিলেন।'

'এই নাম আমি আগে শুনেছি, অনেক দিন তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনিনি, কী ব্যাপার ?'

'তিনি পরলোকগমন করেছেন।'

'আহা ! উনি একজন নামকরা জহুরী ছিলেন।'

'আমি তাঁরই ছেলে। এই হীরেটির কত দাম দেবেন ?'

'এর কোনো দাম হয় না, এটি অমূল্য হীরা। আমার কাছে যত সম্পদ আছে তা সব দিলেও এর পুরো দাম হবে না।'

'তাহলে আমি কী করব ? আমার তো খাবার অভাব।'

'ভাই, সে আর আমি কি বলব ! তবে হীরের দাম নির্ধারণ করলে একে অপমান করা হবে। হ্যাঁ, একটা কথা, তুমি যা নাও, আমি তোমাকে তা দিয়ে দেব।'

'কেমন করে ?'

বৃদ্ধ জহুরী বলল—'আমার তিনটি দোকান আছে। প্রথম দোকানে আমি তোমাকে পনের মিনিট সময় দেব। এই সময়ের মধ্যে তুমি দোকান থেকে যা কিছু আনতে পারবে, সেসব তোমার হয়ে যাবে। জিনিস নেবার জন্য এবং গুছিয়ে রাখার জন্য সব লোক তৈরি থাকবে। তুমি শুধু দোকানের ভেতর থেকে জিনিসগুলি বাইরে আনবে। পনের মিনিট পুরো হয়ে গেলে পরে তুমি আর দোকানে থাকতে পারবে না।' ছেলেটি বলল—'ঠিক আছে।'

ছেলেটিকে দোকান দেখিয়ে দেওয়া হল। সে ঢুকে দেখল যে খুব সাজানো দোকান। লাখ লাখ টাকার হীরে তাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েকটি বাক্সেও রয়েছে, তাতেও হীরে চমক দিচ্ছে। হীরে তো পরের কথা ছেলেটি ঐরকম বাক্সও আগে কখনও দেখেনি। তার তো দেখে মাথা ঘুরে গেল। ছেলেটির সঙ্গে একজন লোক ছিল, সে কেবলই ঘড়ি দেখছিল। কিছুক্ষণ পর সে বলল—'পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে।' ছেলেটি বলল—'দাঁড়াও ভাই, কথা বোলো না ! পনের মিনিট পরে তো আর এখানে থাকতে দেবে না। ভালো করে দেখতে দাও।' এইভাবে পনের মিনিট সময় চলে গেল, তখন সঙ্গের লোকটি বলল—'ব্যস্, পনের মিনিট হয়ে গেছে, চলো, বাইরে চলো। এখন

এখানের কোনো জিনিস আর ছুঁতে পারবে না, একটি দানাও নিতে পারবে না।' ছেলেটি দোকান থেকে বেরিয়ে এলো।

বৃদ্ধ জহুরী দ্বিতীয় দোকানটিতে নিয়ে গেল এবং বলল—'এখানে তোমাকে পঁচিশ মিনিট সময় দেওয়া হল। এর মধ্যে তুমি যা যা জিনিস বাইরে আনতে পারবে, সব তোমার হয়ে যাবে।' ছেলেটি দোকানের ভেতরে গেল। এই দোকানটি আগেরটির থেকেও বেশী সাজানো। তাই দেখে ছেলেটি হতবাক হয়ে ভাবল, এ যেন এক মিউজিয়াম ! কত সুন্দর সব জিনিস ! ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল 'দোকান কি অনেক লম্বা ?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, দোকান অনেকটাই লম্বা এবং বেশি সুন্দর।' ছেলেটি যতোই এগোতে লাগল, ততোই আরও সৌন্দর্য তার নজরে পড়তে লাগল। সঙ্গের লোকটি আগের মতোই জানান দিচ্ছিল যে 'পাঁচ মিনিট হয়েছে', 'দশ মিনিট হয়েছে' করে ! কিন্তু ছেলেটি ভাবল যে আগে তো দেখে নিই, পরে তো আর দেখতেও দেবে না। এইভাবে পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেলে সঙ্গের লোকটি বলল, 'এবার বাইরে যাও। আর কোনো কিছুতে হাত দিতে পারবে না।'

ছেলেটিকে এবার তৃতীয় দোকানটি দেখানো হল এবং বলা হল যে এতে সে ষাট মিনিট অর্থাৎ একঘন্টা সময় পাবে। প্রথম দোকানে জিনিস খুব দামী ছিল, কিন্তু ততো বেশী সাজানো ছিল না। দ্বিতীয় দোকানের জিনিস অত দামের নয়, তবে সাজানো খুব বেশি ছিল। তৃতীয় দোকানটি ক্রোশখানেক লম্বা। এতে খাবার-দাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি শত প্রকার জিনিস ছিল। মোটর-স্কুটার, সাইকেল ইত্যাদি নানাপ্রকার গাড়ি ছিল। নানাস্থানে নাচ-গান হচ্ছিল। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদি পাঁচবিষয়ের নানাপ্রকার জিনিসই সেখানে পাওয়া যাচ্ছিল। ছেলেটি সেইসব জিনিস দেখে মত্ত হয়ে গেল। সে কখনও মোটরগাড়ি চড়ে, কখনও স্কুটারে চড়ে, কখনও দোলনায় ওঠে, কখনও নাটক দেখে। সে এমন সব জিনিস সেখানে দেখতে পেলো যে আগে কখনও তা দেখেনি, বা শোনেনি। সঙ্গের লোকটি বলল, 'দেখো প্রথম দোকান ও দ্বিতীয় দোকান ফাঁকা গেছে এই তৃতীয় দোকানটিও গেল বলে, আর অল্প সময় বাকী আছে, শিগ্‌গির পিছন দিকে চলো !' সেই দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে সময় পূর্ণ হয়ে গেল। হাতের কাছে একটি থলে দেখে সে সেটি নিয়ে বাইরে চলে এলো। দোকানের বাইরে এসে সে থলিটা

খুলে দেখল যে তাতে অচল সিকি, লোহার টুকরো, পাথর এইসব অকেজো জিনিসে ভর্তি ।

বৃদ্ধ মালিক তার লোকেদের বলে রেখেছিল যে, ছেলেটি যেসব জিনিস নেবে তাকে যেন সব জানানো হয়। বৃদ্ধের লোকেরা পরে তাকে এসে জানাল যে ছেলেটি কিছুই নেয়নি। বৃদ্ধ মালিক বলে, 'ওকে এখান থেকে বার করে দাও ! ও যেন আর আমাকে মুখ না দেখায় ! কোনো কাজের নয় !' বেচারী খালি হাতে ফিরে গেল।

যারা এই কাহিনীটি পড়বে, তাদের হয়তো মনে হবে যে, আমরা যদি এইরকম দোকান পাই তাহলে ভালো ভালো জিনিস সব বাইরে নিয়ে চলে আসবো। বাস্তবে আমাদের মনুষ্যজীবনও একটি দোকানের মতো। আমাদের জীবনের প্রথম বছর হল প্রথম দোকানটির মতো, পঁচিশ বছর দ্বিতীয় দোকানটির মতো এবং শেষ ষাঠ বছর হল তৃতীয় দোকানটি। জীবনের প্রথম পনের বছর খেলা-ধূলায় কেটে যায়। তারপরের পঁচিশ বছর কেটে যায় স্ত্রীসুখ এবং ধন-সম্পদ আহরণে। সাধন-ভজন করার কোনো সময়ই তার থাকে না। যদি এই সময় সে সাধন ভজন করে তাহলে এই পঁচিশ বছরে সে সাধনপথে অনেক অমূল্য রত্ন আহরণ করতে পারে। যে এই পঁচিশ বছর বৃথা কাটায়, সে বৃদ্ধাবস্থাতেও সাধন করতে সক্ষম হয় না। চল্লিশ বছর বয়স হলে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের চিন্তা এসে যায়। তাদের বিয়ের পর সংসার আরো বড় হয়ে যায়। সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্য বেড়ে যায়। শরীরের শক্তি সামর্থ্যও কমে আসে। তখন আর ভজন-পূজনের ক্ষমতা থাকে না। এইভাবে নানা চক্রে চালিত হয়ে মানুষ তার অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করে ফেলে।

—— ০ ——

ইন্দ্রের পোশাক

এক রাজা ছিলেন, তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। তাঁর কাছে একজন অত্যন্ত চতুর লোক এল। সে রাজাকে বলল—'অন্নদাতা ! আপনি দেশের সাধারণ পোশাক পরেন, কিন্তু আপনি তো রাজা, আপনার ইন্দ্রের পোশাক পরা উচিত।' রাজা বললেন—'ইন্দ্রের পোশাক ?' লোকটি বলল—

'হ্যাঁ, আপনি যদি রাজী থাকেন, আমি এনে দিতে পারি।' রাজা বললেন—'আচ্ছা, নিয়ে এসো। আমি ইন্দ্রের পোশাক পরব।' লোকটি বলল—'আপনি আমাকে এক লাখ টাকা দিন, পরে বাকী টাকা নেব। আপনি টাকা দিলে তবেই আমি ইন্দ্রের পোশাক আনব।' রাজা তাকে টাকা দিলেন।

কয়েকদিন পর সেই লোকটি একটি অতি সুন্দর বাক্স নিয়ে এসে রাজসভার মধ্যে রাখে। সে বলল—'দেখুন অন্নদাতা ! এটির মধ্যে ইন্দ্রের পোশাক রয়েছে। মানুষ একে দেখতে পাবে না। যার মা-বাবা আসল, সে-ই কেবল এটি দেখতে পাবে ; কিন্তু যে প্রকৃত মা-বাপের সন্তান নয়, সে এই পোশাক দেখতে পাবে না।' এবারে সে বাক্স থেকে পোশাক বার করার অভিনয় করতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'দেখো, এটা হল পাগড়ী, কি চমৎকার ! এই দেখো, কি সুন্দর ধুতি।' লোকে বলতে লাগল, 'আরে সত্যি তো কি সুন্দর পোশাক।' প্রকৃতপক্ষে কেউই কোনো পোশাক দেখতে পাচ্ছিল না, কেননা কোনো পোশাক ছিলই না, তাহলে দেখবে কীকরে ? কিন্তু কেউই কিছু বলল না ; কারণ কেউ যদি বলে পোশাক দেখতে পাচ্ছে না, তাহলে অন্যেরা হয়ত ভাববে যে সে আসল মা-বাবার সন্তান নয়। কেউ কেউ তো ভাবতে লাগল যে, আমার বোধহয় বাবা-মা আসল নয়, আমি পোশাক দেখতে পাচ্ছি না। অন্যে তা পাচ্ছে। এইভাবে সকলেই 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' করে গলা মেলাল। রাজাও কিছু বললেন না।

এবার লোকটি রাজাকে ইন্দ্রের পোশাক পরাতে আরম্ভ করল। প্রথমে ধুতি খুলে ধুতি পরাল, তারপর জামা ও পরে পাগড়ী। আসলে সে কিছুই পরাল না শুধু পরানোর অভিনয় করল। তাতে ফল হল যে রাজা জন্মকালীন (নির্বস্ত্র) পোশাকে থাকলেন।

রাজা এবার সেই অবস্থায় রাণী মহলে গেলেন। রাণীরা রাজাকে দেখে অবাক হল, তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার ! আপনি কি গাঁজা বা ভাঙ্ খেয়েছেন ? কাপড় পরেননি কেন ?' রাজা বললেন—'তোমরা প্রকৃত মা-বাবার সন্তান নও, তাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। এ হল ইন্দ্রের পোশাক !' রাণীরা বললেন—'রাজা ! আপনি যতখুশী ইন্দ্রের পোশাক পরুন, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ধুতিটা অন্ততঃ নিজের দেশেরই পরুন।'

——— ০ ———

প্রকৃত অলংকার

চক্রবেণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মাত্মা। রাজা রাণী দুজনেই চাষ-আবাদ করতেন এবং তাতেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হত। রাজকোষ থেকে তাঁরা কোন অর্থই নিজেদের জন্য খরচ করতেন না। প্রজাদের থেকে যে কর আদায় হত, তা তিনি প্রজাহিতেই ব্যয় করতেন। রাজা হলেও তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সাধারণ খাওয়া-দাওয়া করতেন।

শহরে একদিন কোন উৎসব হল। শহরের সব রমণীরা রাণীর কাছে এল, তারা সকলেই অত্যন্ত দামী শাড়ী এবং হীরে জহরতের গহনা পরেছিল। তারা সকলে রাণীকে দেখে বলল—'আপনি আমাদের প্রভু, আপনার তো আমাদের থেকে দামী শাড়ী-গহনা পরা উচিত। কিন্তু আপনি অতি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করে আছেন !' রাণী খুব নরম স্বভাবের ছিলেন, তাঁর মনে কথাটা ঠিক বলে মনে হল। রাত্রিবেলা তিনি রাজাকে বললেন—'আজকে আমি একটু অপমানিত হয়েছি। আমাদের প্রজাদের স্ত্রীরা সকলে খুব দামী দামী শাড়ী গহনা পরে এসেছিল, আর আমরা ওদের রাজরাণী হয়েও আমাদের এই দশা !' রাজা বললেন—'দেখো, আমরা চাষ-আবাদ করি। তাতে যা আয় হয় তার প্রায় সবটাই খরচ হয়ে যায়। বেশি তো আয় হয় না, কি করব বল ? প্রজাদের টাকা আমি নিজেদের জন্য ব্যয় করি না। ঠিক আছে, আমি তোমার গহনার জন্য কিছু ব্যবস্থা করব, তুমি ধৈর্য ধর।'

একদিন রাজা চক্রবেণ তাঁর এক অনুচরকে বললেন—'তুমি লঙ্কাপতি রাবণের কাছে গিয়ে বলো যে চক্রবেণ আপনাকে কর দিতে বলেছেন। তাঁর কাছ থেকে কর-স্বরূপ সোনা নিয়ে এসো।' অনুচরটি লঙ্কায় রাবণের কাছে গেল। রাবণ তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার, এসেছ কেন ?' সে বলল—'মহারাজ চক্রবেণ আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছ থেকে কর নেবার জন্য।' রাবণ অট্টহাসি করে বললেন—'আরে ! এখনও জগতে এমন মূর্খ লোক আছে যে রাবণের কাছ থেকে কর চায়। তার কি বুদ্ধিভ্রম হয়েছে ? রাবণ কি কখনও কর দেয় ?' লোকটি বলল—'আপনাকে কর দিতেই হবে।

দিয়ে দেন তো ভালো কথা।' রাবণ তাকে অপমান করে বললেন—'তোমার একথা আমার সামনে বলার সাহস হল কোথা থেকে ? যাও, চলে যাও এখান থেকে।'

রাত্রে মন্দোদরীর সঙ্গে দেখা হতে রাবণ বললেন—'জগতে এমন মূর্খও আছে! আজ চক্রবেণের একজন অনুচর এসেছিলো, আমার কাছ থেকে কর বাবদ সোনা চাইছিল।' মন্দোদরী জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কি কর দিয়েছেন ?' রাবণ বললেন—'তুমিও এমন কথা বলো ! তুমি কি পাগল, বুঝতে পারছ না ? তুমি আমার মহিমা জান না ? আমি রাবণ ! রাবণ কি কখনও কর দেয় ?' মন্দোদরী বললেন—'মহারাজ ! দয়া করে আপনি কর দিয়ে দিন, না দিলে ভালো হবে না। আপনার কর অবশ্যই দেওয়া উচিত।' মন্দোদরী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, তাই তিনি চক্রবেণের প্রভাব জানতেন, রাবণ এতো জানতেন না। ভোরবেলা রাবণ যখন উঠে বাইরে যাচ্ছিলেন, মন্দোদরী তাঁকে আটকালেন, বললেন—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে একটা মজা দেখাব।' রাবণ অপেক্ষা করে রইলেন। মন্দোদরী প্রত্যহ ছাদে পায়রাদের শস্যদানা খাওয়াতেন। দানা দেবার পর যখন পায়রাগুলি দানা খুঁটে খাচ্ছিল, তখন মন্দোদরী তাদের বললেন—'মহরাজাধিরাজ রাবণের দিব্যি যদি একটি দানাও খুঁটে নাও !' পায়রাগুলি সে কথায় কোনও গ্রাহ্য না করে দানা খুঁটতে লাগল। মন্দোদরী বললেন—'দেখেছেন তো আপনার কত মহিমা ?' রাবণ বললেন—'তুমি কি পাগল ? রাবণের কি মহিমা তা পাখীরা কেমন করে জানবে ?' মন্দোদরী বললেন—'এবার দেখুন, বলে বললেন যদি একটি দানাও খুঁটে খাও তাহলে রাজা চক্রবেণের দিব্যি।' একথা বলতেই পায়রাগুলি সব দানা খুঁটে খাওয়া বন্ধ করে দিল। একটি পায়রা শুধু দানা খুঁটিতে গেল আর তখনই তার মাথা কেটে পড়ল। আসলে সেই পায়রাটি বধির ছিল, তাই সে মন্দোদরীর কথা শুনতে পায়নি। রাবণ বললেন—'এ তোমার কোনো জাদু, আমি একথা মানতে পারব না।' বলে রাবণ চলে গেলেন।

রাবণ গিয়ে রাজসিংহাসনে বসলেন। রাজা চক্রবেণের অনুচর আবার সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'রাত্রে আপনি কি কিছু চিন্তা করেছেন ?

আপনাকে কর বাবদ সোনা দিতে হবে।' রাবণ সহাস্যে উত্তর দিলেন—'তুমি কেমন লোক হে ? দেবতারা পর্যন্ত আমাকে দুবেলা নমস্কার করে, আর আমি কিনা কর দেব ?' লোকটি বলল—'ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আপনি একটু সমুদ্রের ধারে চলুন।' রাবণের কোন ভয়-ডর ছিল না, তিনি লোকটির সঙ্গে সমুদ্রের ধারে গেলেন। লোকটি সমুদ্রের ধারে বালির ওপর লঙ্কা নগরীর মতো একটি ছবি আঁকল। লঙ্কার চারদিকে যেমন চারটি দরজা তেমন চারটি দরজা আঁকল এবং রাবণকে জিজ্ঞাসা করল, 'লঙ্কা এরকম তো ?' রাবণ বললেন—'হ্যাঁ, এইরকমই। তুমি বেশ ভালো কারিগর।' সেই লোকটি বলল—'এবার মনোযোগ দিয়ে দেখুন, মহারাজ চক্রবেণের দিব্যি' এই বলে সে হাত দিয়ে একটি দরজা ভেঙ্গে ফেলল। এদিকে বালির একটা দরজা ভাঙ্গল আর ওদিকে আসল লঙ্কানগরীতেও সেই দরজাটি ভেঙ্গে পড়ল। তখন সেই লোকটি বলল—'কর দেবেন কি না ? নাহলে আমি হাত দিয়ে সমস্ত লঙ্কা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব।' রাবণ এবার ভয় পেয়ে বললেন—'চেঁচিয়ো না, তোমার যা চাই সব নিয়ে চুপচাপ চলে যাও।' রাবণ তাকে নিয়ে গিয়ে করবাবদ অনেক সোনা দিয়ে দিলেন।

রাবণের কাছ থেকে কর নিয়ে অনুচরটি চক্রবেণের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত সোনা দিয়ে দিল। চক্রবেণ সেই সোনা রাণীকে দিয়ে বললেন—'এই নাও সোনা, এতে যত চাও, তত গহনা তৈরি করিয়ে নাও।' রাণী জিজ্ঞাসা করলেন এতো সোনা কোথা থেকে পাওয়া গেল। রাজা জানালেন রাবণের কাছ থেকে কর বাবদ পাওয়া গেছে। রাণী অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, রাবণ কেন কর দিল। তিনি অনুচরটিকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে কীভাবে কর নিয়ে এলো ? অনুচরটি সব কথা তাঁকে জানাল। সমস্ত শুনে রাণী অবাক হলেন, তিনি বললেন—'আমার প্রকৃত গহনা তো আমার স্বামী। অন্য গহনা আমার চাই না। পতির জন্যই গহনার শোভা, তিনি ছাড়া কীসের শোভা ? যাঁর এতো প্রভাব যে রাবণও ভীত সন্ত্রস্ত হয়, তাঁর থেকে বড়ো গহনা আর হতে পারে না। রাণী অনুচরটিকে বললেন—'যাও, রাবণকে সব সোনা ফিরিয়ে দিয়ে এসো এবং বোলো যে মহারাজ চক্রবেণ তোমার কর গ্রহণ করেন নি।'

——— ০ ———

কৃপণতার পরিণাম

একজন গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর কন্যার বিবাহের কথা চলছিল। তিনি ভেবেছিলেন ধর্মকথা শুনিয়ে কিছু রোজগার করবেন এবং তাতেই তাঁর কন্যার বিবাহ হয়ে যাবে। সেই ভেবে তিনি ভগবান রামের মন্দিরে গিয়ে কথকথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মনের ভাব ছিল এইরকম যে, কোনো শ্রোতা আসুক বা না আসুক, ভগবান রাম তো কথা শুনবেন।

কিছু কিছু শ্রোতা পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কথকথা শুনতে আসতে শুরু করল। একজন ধনী ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ। সে একদিন মন্দিরে এল। যখন সেই ধনী ব্যক্তিটি মন্দির পরিক্রমা করছিল, তখন সে মন্দিরের ভেতরে কিছু কথার আওয়াজ পেল, তার মনে হল যেন দুজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কোনোকিছু নিয়ে আলোচনা করছে। সেই ব্যক্তি কান পেতে শুনল যে ভগবান রাম হনুমানকে বলছেন যে এই গরীব ব্রাহ্মণটির জন্য যেন একশ টাকা পাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যাতে সে কন্যাদান করতে পারে। হনুমান বললেন যে ঠিক আছে, তিনি ব্রাহ্মণের জন্য ঐ টাকার ব্যবস্থা করবেন। ধনী ব্যক্তি এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করল এবং তাঁকে বলল—'মহারাজ! কথকথা বলে কিছু টাকা পয়সা পাচ্ছেন কি?' ব্রাহ্মণ বললেন—'শ্রোতা তো তেমন আসছে না, টাকা কি করে আসবে?' ধনী ব্যক্তি বলল—'আমার একটা শর্ত আছে। ধর্মকথা শুনিয়ে যা প্রণামী পাবেন, তা আমাকে দিয়ে দেবেন, আমি পঞ্চাশ টাকা আপনাকে দেব।' ব্রাহ্মণ সেই শর্ত মেনে নিলেন। তিনি ভাবলেন যে ধর্মকথা শুনিয়ে তো এতো টাকা আসবে না, শেঠজী যদি পঞ্চাশ টাকা করে দেন, তাতে কিছু অন্ততঃ সুরাহা হবে। আগেকার সময়ে পঞ্চাশ টাকা অনেক বেশী ছিল। এদিকে ধনীটি ভেবেছিল যে হনুমানজী ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই একশ টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। তার থেকে পঞ্চাশ টাকা আমি নেব আর বাকী পঞ্চাশ ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেব, পঞ্চাশ টাকা আমার লাভ থাকবে। লোভী ব্যক্তিরা সর্বদা টাকা পয়সার কথাই চিন্তা করে। তাই ভগবান এবং হনুমানের কথাবার্তা শুনে তার ভক্তি উৎপন্ন হয়নি, উলটে লোভই তার মনকে অধিকার করেছিল।

কথকথা শেষ হলে ধনীটি ব্রাহ্মণের কাছে এল। সে মনে করেছিল যে

আজ একশতটাকা প্রণামী হিসাবে পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণ বললেন—'দেখুন আজ প্রণামী তো খুবই কম পড়েছে। মাত্র পাঁচ-সাত টাকার মত।' বেচারী ধনী আর কি করে, সে তার কথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল। আমদানির বদলে তার ক্ষতি হল। সে হনুমানের ওপর খুব রেগে গেল কেননা সে ভগবানের নির্দেশ অমান্য করেছে, ব্রাহ্মণকে একশ টাকা দেয়নি। সে মন্দিরে ঢুকে হনুমানের মূর্তিতে এক ঘুঁসি মারল। যেই না ঘুঁসি মারা তার হাত মূর্তিতে আটকে গেল। বহু চেষ্টা করেও সে হাত বার করে আনতে পারল না। হনুমানের শক্তির কাছে তার আর কি জোর! সে কি আর সহজে ছাড়া পায়? ধনী ব্যক্তি আবার কথা শুনতে পেল। সে মনোযোগ দিয়ে শুনল ভগবান হনুমানকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তুমি ব্রাহ্মণকে একশটাকা দিয়েছ কি?' হনুমান জবাব দিলেন—'প্রভু! পঞ্চাশ টাকা পাইয়ে দিয়েছি, বাকী পঞ্চাশ টাকার জন্য ধনী ব্যক্তিটিকে আটকে রেখেছি। এ পঞ্চাশ টাকা দিলে তবে ছাড়ব।' ধনীটি শুনে ভাবল মন্দিরে লোকে আমাকে এভাবে দেখলে বড়ো অপমানিত হবো। সে চিৎকার করে বলল—'হনুমানজী! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি পঞ্চাশ টাকা দেব।' হনুমান তখন ধনীর হাত মুক্ত করে দিলেন। ধনী গিয়ে ব্রাহ্মণকে আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এলো। লোভী ব্যক্তির এরূপ-ই দণ্ড হওয়া উচিত।

———— ০ ————

সাধু যখন রাজা হলেন

এক সাধু ছিলেন। পথ চলতে চলতে তিনি একদিন এক নগরপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় নগরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই সাধু সেদিনের মত নগরের শয্যাগ্রহণ করলেন। দৈবযোগে সেইদিনই সেই নগরের রাজা দেহরক্ষা করেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন। সেইজন্য রাজ্য পাওয়ার জন্য তাঁর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মারামারি সুরু হয়ে গেল। সকলেই বলতে লাগল তার অধিকার সবথেকে বেশী। শেষে সকলে মিলে ঠিক হল যে কালপ্রাতে নগরের দরজা খোলা হতে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নগরে প্রবেশ করবে, তাকেই রাজা করা হবে। এরূপ ঠিক হওয়ায় ঝগড়া মিটে গেল।

পরদিন প্রাতে নগরের দরজা খুলতে সর্বপ্রথম সাধু ভেতরে গেল। সাধু ভেতরে ঢুকতেই এক হস্তিনী তাঁকে শুঁড়ে করে পিঠের ওপর বসিয়ে নিল। নগরের লোক জয় ধ্বনি দিতে লাগল। তারা সাধুকে নিয়ে রাজদরবারে গেল। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কি ব্যাপার ! তারা সাধুকে জানাল যে তারা ঠিক করেছে যিনি সর্বপ্রথম সেদিন নগরে প্রবেশ করবেন, তাঁকেই রাজা করা হবে। সর্বপ্রথম সাধুই প্রবেশ করেছেন, তাই তাঁকেই এই নগরের রাজা হিসাবে মনোনীত করা হল। সাধুজী সেই কথা মেনে নিলেন। তিনি স্নান সমাপন করে রাজার পোষাক পরলেন আর একটি বাক্স নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। বাক্স নিয়ে আসা হলে সাধু তাঁর কাপড়-চোপড়, ভিক্ষা পাত্র, খড়ম ইত্যাদি তার মধ্যে রেখে বাক্সে তালা দিয়ে সেটি নিজের কাছে রাখলেন। তারপর সাধু অত্যন্ত সুন্দর ভাবে রাজ্য চালাতে লাগলেন।

সাধুর নিজের কোনো কামনা-বাসনা ছিল না, মনে কোনোপ্রকার দুশ্চিন্তাও ছিল না এবং কোনোপ্রকার ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। তিনি রাজ্য পরিচালনাকে ভগবানের কাজ মনে করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলরীতিতে রাজ্য চালাতে লাগলেন। এর ফলে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হল। ধন-সম্পদের বৃদ্ধি হতে লাগল, রাজকোষ ভরে গেল। প্রজারা সকলেই সুখী হল। রাজ্যের এইরূপ সমৃদ্ধি দেখে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা ভাবল, সাধু রাজ্য পরিচালনা করতে জানলেও, যুদ্ধ করতে নিশ্চয়ই তত দক্ষ নয়। সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। রাজ্যের গুপ্তচর এসে সাধুকে খবর দিল যে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা যুদ্ধ করতে আসছে। সাধু বললেন—'আসতে দাও, আমরা যুদ্ধ করব না।' কয়েকদিন পরে খবর এলো যে শত্রুসৈন্য কাছাকাছি এসে গেছে। সাধু বললেন—'আসতে দাও।' পরে আবার খবর এলো যে শত্রু সৈন্য নগরপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছে। তখন সাধু চর পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা কেন এসেছেন ?' প্রতিবেশী রাজা উত্তরে জানালেন যে তাঁরা এই রাজ্য দখল করতে এসেছেন। সাধু তাঁকে বললেন রাজ্য পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করার কী প্রয়োজন। তিনি তাঁর অনুচরকে বাক্স নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। বাক্স এলে তিনি সেটি খুলে নিজের সাধুর বেশ পরিধান করে হাতে ভিক্ষাপাত্র নিলেন। তিনি প্রতিবেশী রাজাকে বললেন—'এতদিন আমি রাজ্য চালিয়েছি, এখন আপনি চালান। আমি অপেক্ষা করে ছিলাম কেননা এই

রাজ্য পরিচালনা করার জন্য কেউ ছিল না। এখন আপনি এসে গেছেন, আপনি এই রাজ্যের ভার নিন। মিছিমিছি যুদ্ধ করে কিছু মানুষকে হত্যা করে কী লাভ ?'

এই কাহিনীর অর্থ এই নয় যে শত্রু আক্রমণ করতে এলে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে হবে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল যে সাধুর সামনে যখন যে কাজ এসেছে তা ভগবদ্ প্রেরিত মনে করে তিনি নিষ্কামভাবে তা পালন করেছেন। তাঁর নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা এর পিছনে ছিল না। তাই রাজা হতেও যেমন তাঁর বাধেনি তেমনই রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ও তিনি কোনো দুঃখবোধ করেন নি। মানবজীবনে এই শিক্ষাই নেওয়া উচিত।

—— ○ ——

অপরের কল্যাণ কে করতে পারেন ?

এক রাজা ছিলেন। তিনি শুনেছিলেন রাজা পরীক্ষিৎ ভাগবৎ কথা শুনেছিলেন, তাই তাঁর কল্যাণ হয়েছিল। রাজা মনে করলেন, 'আমিও যদি ভাগবৎ কথা শুনি তাহলে আমারও কল্যাণ হবে।' মনে মনে এই চিন্তা করে রাজা একজন পণ্ডিতকে ডাকিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। পণ্ডিত ভাগবৎ কথা শোনাতে রাজী হলেন এবং কথা শোনাতে আরম্ভ করলেন। সাতদিনে কথা সমাপ্ত হয়ে গেল।

একদিন রাজা পণ্ডিতকে ডাকালেন এবং বললেন যে—'পণ্ডিতজী ! ভাগবৎ কথা শোনানোতে আপনি কোনো ত্রুটি রাখেন নি আর আমিও কথা শুনতে আগ্রহের অভাব রাখিনি। তাহলে ভাগবৎ শোনার পর কোন পার্থক্য বোধ করছি না কেন, কি ব্যাপার ?' পণ্ডিত বললেন—'আমি বলতে পারব না, আমার গুরুই এর উত্তর দিতে পারেন।' রাজা তাঁকে বললেন—'আপনি আপনার গুরুকে সম্মান সহকারে এখানে নিয়ে আসুন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।' পণ্ডিত তাঁর গুরুকে রাজার কাছে নিয়ে এলেন। রাজা তাঁকে তাঁর মনের কথা জানালেন, 'ভাগবৎ কথা শোনার পরেও তাঁর কল্যাণ হয়নি কেন এবং মনের বিক্ষোভ কেন দূর হয়নি ?' গুরুজী বললেন—'কিছুক্ষণের জন্য আমাকে আপনার অধিকার ছেড়ে দিন।' রাজা তাই মেনে নিলেন। গুরু

আদেশ দিলেন, 'রাজা ও পণ্ডিত দুজনকেই বেঁধে রাখ।' রাজপুরুষেরা তাই করল। তখন গুরু পণ্ডিতকে বললেন—'তুমি রাজার বাঁধন খুলে দাও।' পণ্ডিত বললেন—'আমি নিজেই বাঁধা আছি, রাজাকে কি করে খুলে দেব !' গুরু রাজাকে বললেন—'আপনি পণ্ডিতকে খুলে দিন।' রাজাও বললেন—'আমি নিজেই বাঁধা আছি, পণ্ডিতকে কি করে খুলব !' তখন গুরু বললেন—'মহারাজ ! আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।' রাজা বললেন—'আমি কিছু বুঝতে পারিনি।' গুরু বললেন—'কোনো ব্যক্তি নিজে বন্ধন অবস্থায় থেকে যেমন অন্যকে মুক্ত করতে পারে না, তেমনই যে ব্যক্তি নিজেই মুক্ত নয় সে কী করে অন্যকে বন্ধন মুক্ত করবে ? অন্যের কল্যাণ করবে কী করে ?' যাঁর উপলব্ধি হয়েছে এরূপ মুক্ত মহাপুরুষের দ্বারা যে লাভ হয়, তা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তাই অনুভবী মুক্ত মহাপুরুষের বাণী অনুসারেই জীবন তৈরি করা উচিত।'

নিরানব্বইয়ের ফের

এক ধনীর প্রাসাদ ছিল আর তার পাশেই ছিল একটি দরিদ্রের কুটির। দুই বাড়ির রমণীরা কাজকর্মের পরে একে অন্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, গল্পগুজব করত। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করত বাড়িতে কি হল, কি কি রান্না হল। ধনীর রমণী বলত, 'আজ কচুর তরকারী রান্না করেছি' অথবা 'আজ শুধু ডাল করেছি।' গরিব ঘরের রমণী বলত 'আজ আমি হালুয়া-ডালপুরী তৈরি করেছি' বা বলত 'আজ ক্ষীর-পায়েস রান্না করেছি।' ধনীর স্ত্রী তার স্বামীকে বলল—'আমরা এত ধনী অথচ আমরা সাধারণ খাবার খাই, কিন্তু পাশের বাড়ির ওরা গরিব হলেও কত ভালো জিনিস খায়। ব্যাপার কি ?' ধনী ব্যক্তি বলল—'ওরা তো নিরানব্বইয়ের ফেরে পড়েনি, তাই খেয়ে শেষ করে। যখন নিরানব্বইয়ের ফেরে পড়বে, তখন আর এত খাবে না।' ধনীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'এই নিরানব্বইয়ের ফের ব্যাপারটা কি ?' ধনী বলল—'বলছি, তুমি শুধু দেখতে থাক।'

একদিন ধনী তার স্ত্রীকে বলল—'তুমি নিরানব্বই টাকা নিয়ে এসো।'

রমণী তাই আনল। ধনী ওই টাকা একটি পুঁটলীতে ভরে তার স্ত্রীকে বলল রাত্রে কোনো সময় থলিটি গরিব প্রতিবেশীর ঘরে ফেলে আসতে। রাত্রি হলে ধনীর স্ত্রী থলিটি ফেলে এলো। সকালবেলা প্রতিবেশী ভদ্রলোক অঙ্গনে থলিটি কুড়িয়ে পেল, সে থলি খুলে দেখল তাতে টাকা রয়েছে। তারা দুজনে গুণে দেখল তাতে একশ টাকা থেকে একটাকা কম রয়েছে। দুজনে তখন আলোচনা করল যে কয়েকদিন খরচ কমিয়ে একটা টাকা বাঁচালে একশত টাকা পূর্ণ হবে। এই ঠিক করে তারা দু চার পয়সা করে বাঁচাতে আরম্ভ করল এবং কয়েকদিনেই একটাকা পূর্ণ হয়ে একশ টাকা হয়ে গেল। তখন তারা ভাবতে লাগল যে, 'আমরা মাত্র কয়েক দিন পয়সা বাঁচিয়েই একটাকা জমিয়ে নিয়েছি, যদি আগে থেকে একটু খেয়াল করে পয়সা জমাতাম তাহলে এতদিনে কতটাকা জমিয়ে ফেলতাম। মিছিমিছি অনেক টাকা বৃথা খরচ করেছি। এবার থেকে একটু জমাতে হবে।'

কয়েকদিন পরে ধনী ব্যক্তি তার পত্নীকে বলল—'আজ যাও প্রতিবেশীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে এসো, তারা কি রান্না করেছে ?' ধনীর স্ত্রী প্রতিবেশীর বউকে জিজ্ঞাসা করল আজ তাদের কি রান্না হয়েছে। প্রতিবেশীর গৃহিণী জবাব দিল—'আজ বেশী কিছু হয়নি, চাটনী করেছি, রুটি দিয়ে তাই খেয়ে নেব।' ধনীর স্ত্রী এবার নিরানব্বাইয়ের ফের কি তা বুঝতে পারল !

জ্ঞান বৃদ্ধি পায় গুণবানের সঙ্গে, ধ্যান বাড়ে তপস্বীর সঙ্গে।
মোক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় পরিজনের সঙ্গে, লোভ বৃদ্ধি হয় ধনে চিত্ত দিলে।।
মূঢ়ের সঙ্গপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ বাড়ে আর কাম বৃদ্ধি হয় নারী সঙ্গে।
'কবি দীন' সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গ করলে বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা বাড়ে।।

—— ◦ ——

গাধার থেকে মনুষ্য সৃষ্টি

এক বৈদ্য ছিল। সে সবসময় একজন লোককে তার সঙ্গে রাখত। একদিন বৈদ্য যখন গ্রাম থেকে কোথাও যাচ্ছিল তখন সে ওই লোকটিকে তিরস্কার করছিল—'আরে, তুই জানিস্ না তুই আগে কি ছিলি ? তুই আগে গাধা ছিলি। আমি তোকে গাধার থেকে মানুষ করলাম। তোর এত উপকার

করলাম, আর তুই কিনা আমার কথা শুনিস্ না।' সেইখান দিয়ে এক গাধাওয়ালা যাচ্ছিল, সে বৈদ্যের কথা শুনতে পেল যে ইনি গাধার থেকে মানুষ তৈরী করেন। সে বৈদ্যের কাছে এসে বলল—'মহারাজ! আমার কাছে অনেকগুলি গাধা আছে, আমি আপনাকে দুটি গাধা দিচ্ছি, দয়া করে আপনি এদের মানুষ করে দিন।' বৈদ্য বলল—'ঠিক আছে মানুষ করে দেব, কিন্তু কিছু টাকা লাগবে। এক একটি গাধার জন্য একশ টাকা করে দিতে হবে।' গাধাওয়ালা বলল—'ঠিক আছে, আমি এখনই আপনাকে পুরো টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি এদের মানুষ করে দিন।' সে বৈদ্যকে দুশ টাকা দিয়ে দিল এবং দুটি গাধা রেখে চলে গেল।

বৈদ্য গাধা দুটিকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দিল। কিছুদিন পরে গাধাওয়ালা এসে যখন জিজ্ঞাসা করল তখন বৈদ্য বলল—'মশলা দিয়ে রেখেছি, এখন ওরা মানুষ হচ্ছে।' এইভাবে তিন-চার মাস কেটে গেল। তারপরে যখন সেই গাধাওয়ালা এলো, তখন বৈদ্য বলল—'আরে, তুমি এতদিন আসনি কেন? তোমার গাধা তো অনেকদিন মানুষ হয়ে গেছে, তারা চাকরীও করতে আরম্ভ করেছে। যে গাধাটির গায়ে লোম বেশী ছিল সে শিক্ষক হয়ে স্কুলে পড়াচ্ছে আর অন্যটি স্টেশন মাষ্টার হয়েছে। দুজনকে আমি ভালোভাবে মানুষ তৈরি করেছি। কিন্তু তুমি এতো দেরি করে এলে, তাই মশলা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, তাই ওরা চাকরি পেয়ে গেল। আমি আর কিছু জানি না।'

গাধাওয়ালা ঘাস নিয়ে স্কুলে গেল। বৈদ্য যার নাম বলেছিলো সেই দাড়িওয়ালা শিক্ষকের সামনে গিয়ে সে ঘাস রেখে বলতে লাগল—'আয়! আয়! ঘাস খেয়ে নে।' শিক্ষক চিৎকার করে উঠল—'আরে! এ কে? কী করছে এখানে, পাগল না কি?' গাধাওয়ালা বলল—'আমি একশ টাকা খরচ করে তোকে গাধা থেকে মানুষ করেছি। আমি পাগল হয়ে গেলাম।' শিক্ষক তখন সেই লোকটিকে পাগল বলে স্কুল থেকে বার করে দিল।

এবার সে স্টেশন মাস্টারের কাছে গেল। সেখানেও সে ঘাস নিয়ে গিয়ে স্টেশন মাস্টারকে বলতে লাগল—'আয়, আয়, ঘাস খাবি আয়।' স্টেশন মাস্টার বলল—'আরে, এ এখানে কি করছে।' লোকেরা জানাল এই লোকটি স্কুলেও গিয়েছিল এবং সেখানে স্কুল মাস্টারকেও এইভাবে

বলেছিল। স্টেশন মাস্টারও তাকে পাগল ভেবে বাইরে বার করে দিল। গাধাওয়ালা বৈদ্যের কাছে এলো আর বলল—'ওরা দুজনেই তো আমাকে পাগল বলছে।' বৈদ্য বলল—'আরে ! আমি তো আগেই বলেছি যে তুমি দেরি করে ফেলেছ। সেইজন্য ওদের ওপর মশলা বেশি দেওয়া হয়েছিল। বেশি মশলা দেওয়ায় এরা আর আমাদের আয়ত্তে নেই। আমি আর কী করব ?'

মানুষ এইভাবে অহংকারবশতঃ মনে করে আমিं খুব বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, এসবই তার ওপর বেশি হওয়ার ফল। সে জানে না আগের জন্মে কি ছিল, এজন্মে মানুষ হয়ে মনে করে আমি কি হয়েছি, তোমরা জান না। এইভাবে তার অহংভাব বেড়ে যায় এবং সে তখন কারো কথাই মানে না।

—— ০ ——

রাত্রি কেমন কাটল ?

একজন সাধু ঘুরতে ঘুরতে এক নগরে এসে পৌঁছালেন। রাত্রি হয়ে এসেছে, শীতের দিন। নগরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সাধুর শীত করছিল কেননা তাঁর কাছে কোনো গরম কাপড় ছিল না। সাধু শোওয়ার জন্য জায়গা খুঁজছিলেন। কাছেই এক ভুজিয়ার দোকান ছিল। সাধু দেখলেন জায়গাটি রাত্রে থাকার পক্ষে উত্তম, ভুজিয়াওয়ালার উনুন থেকে তখনও গরম হাওয়া বেরোচ্ছে। সাধু ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকালবেলা সাধুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশেই রাজার প্রাসাদ, তাঁরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে। রাজা তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলে—'বলো সব, রাত কেমন কাটল।' সাধু সেই ভুজিয়ার দোকান থেকে উত্তর দিলেন—'কিছু তোমার মত, কিছু তোমার থেকে ভাল।' রাজা অচেনা আওয়াজ শুনে একটু অবাক হলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'রাত্রি কেমনভাবে কাটল।' সাধু আবার বললেন—'কিছুটা তোমার মত, কিছুটা তোমার থেকে ভাল।' রাজা তাঁর অনুচরদের বললেন, 'দেখো তো, কে এই কথাগুলি বলছে ? তাকে ধরে নিয়ে এসো আমার সামনে।' রাজ-অনুচরেরা বাইরে গিয়ে চতুর্দিকে দেখতে লাগল, কিন্তু তারা কাউকে দেখতে পেলো না। সাধু যখন আবার কথা

বললেন, তখন রাজ-অনুচরেরা দেখতে পেল যে ভুজিয়াওয়ালার দোকানের মধ্যে বসে এক সাধু ঐ কথাগুলি বলছেন। তারা সাধুকে বলল—'চলুন, রাজা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।' সাধু বললেন, 'কেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে রাজা আমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন ?' তারা উত্তর দিল—'আপনার কোনো অপরাধের জন্য নয়, রাজা আপনাকে ডেকেছেন কিছু কথা বলার জন্য।' সাধু দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন , তাঁর সমস্ত গায়ে মুখে ভুজিয়ার দোকানের ছাই লেগেছিল। কোনো কোনো স্থানে কালিও লেগেছিল, সাধু সেই অবস্থাতেই রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হলেন।

রাজ-অনুচরেরা সাধুকে রাজার সামনে হাজির করল। রাজা সাধুকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—'সকালে আমি যা প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কি তার উত্তর দিয়েছিলেন ?' সাধু বললেন—'আমি জানতাম না প্রশ্ন আপনি করছেন, আমি শুধু প্রশ্নটা শুনে উত্তর দিয়েছিলাম।' রাজা বললেন—'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম রাত কেমন কাটল, তার উত্তরে আপনি বলেছেন কিছু তোমার মত, কিছু তোমার থেকেও ভাল। আপনি বলুন আমার মত রাত কি করে কাটালেন ? আমি তো প্রাসাদে ঘুমোচ্ছিলাম আর আপনি ভুজিয়ার দোকানে, তাহলে আমার মত কীকরে হল ?' সাধু বললেন—'যখন আমি বা আপনি ঘুমিয়েছিলাম তখন আমার মনে ছিল না যে আমি ভুজিয়ার দোকানে শুয়ে আছি এবং আপনারও খেয়াল ছিল না যে আপনি প্রাসাদে ঘুমিয়ে আছেন। তাহলে আমরা দুজনেই সমান হলাম কি না ? আপনি নরম গদিতে শুয়েছিলেন আর আমি নরম ছাইয়ের ওপর শুয়ে ঘুমিয়েছিলাম।' রাজা বললেন—'আর আমার থেকে ভালো কী করে হলো ?' সাধু বললেন—'ঘুম ভাঙ্গতেই আপনার মাথায় রাজ্যের সমস্ত চিন্তা এসে আপনাকে জ্বালাতন করতে শুরু করে, কিন্তু আমার কোনো চিন্তা নেই। তাই আমার রাত্রি আপনার থেকে ভালোভাবে কেটেছে।'

চাহ গয়ী চিন্তা মিটি মনুআঁ বেপরবাহ।
জিনকো কুছ ন চাহিয়ে সো সাহনপতি সাহ॥

———— ० ————

শ্বশুরবাড়ির নিয়ম

একটি মেয়ে বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে এলো। শ্বশুরবাড়িতে তার স্বামী শাশুড়ি ছাড়া একজন দিদিশাশুড়ি অর্থাৎ শাশুড়ির শাশুড়ি থাকতেন। মেয়েটি বউ হয়ে এসে দেখল শ্বশুরবাড়িতে তার দিদিশাশুড়ির খুব অনাদর, অসম্মান করা হয়। বউটির শাশুড়ি কথায় কথায় তার শাশুড়িকে আঘাত দিত, গালিগালাজ করত। তাই দেখে বউটির খুব খারাপ লাগত এবং বৃদ্ধার জন্য দুঃখ হত। সে মনে মনে ভাবল যে, আমি যদি আমার শাশুড়িকে বলি যে আপনি ঠাকুমাকে অপমান করবেন না, তাহলে উনি বলবেন, সেদিনের মেয়ে আমাকে উপদেশ দিতে এসেছে, আমার গুরুঠাকুর হয়েছে। তাই বউটি শাশুড়িকে কিছুই বলল না। তার বদলে সে একটি উপায় ভেবে বার করল। সে প্রত্যেকদিন সংসারের কাজকর্মের পরে দিদিশাশুড়ির কাছে বসে তাঁর পা টিপে দিত। সে অনেকক্ষণ সেখানে বসত, তার শাশুড়ির সেটা পছন্দ ছিল না। একদিন শাশুড়ি বউকে জিজ্ঞাসা করল—'বউমা ! ওখানে গিয়েছ কেন ?' বউ উত্তর দিল—'কিছু কাজ আছে, বলুন।' শাশুড়ি বলল—'কাজ আর কি, তুমি ওখানে গেছ কেন ?' বউটি বলল—'আমার বাবা বলেছেন যে অল্পবয়সী ছেলে বা মেয়েদের সঙ্গে বেশি গল্প করবে না। ঘরে যিনি বয়স্ক মানুষ থাকবেন, তাঁর কাছে থাকবে, তাঁর থেকে শিক্ষা নেবে। এখানে তো সব থেকে বয়স্ক মানুষ এই ঠাকুমা তাই এঁর কাছেই বসি। আবার আমার বাবা এও বলেছেন যে এখানে আমার বাপের বাড়ির নিয়ম কানুন চলবে না, এখানে এই বাড়ির নিয়ম চলবে। আমাকে তো এখানকার রীতি নিয়ম শিখতে হবে, তাই আমি ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করি যে আমার শাশুড়ি আপনার কেমন সেবা-যত্ন করেন।' শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুড়ি কি বলল ?' বউ বলল, 'ঠাকুমা বলেন তোমার শাশুড়ি যেদিন আমাকে গালি না দেন, অসম্মান না করেন, সেদিন মনে করি উনি আমার সেবা করলেন।' শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিও কি তাই করবে নাকি ?' বউ বলল, 'আমি তা বলিনি, আমার বাবা তো বড়দের কাছ থেকে শিখতে বলেছেন, তাই শিখেছি।'

শাশুড়ি ভয় পেয়ে গেল, ভাবল আমি আমার শাশুড়ির সঙ্গে যে ব্যবহার করব, সেই ব্যবহারই আমার সঙ্গে আমার বউ করবে। এক কোণে কিছু মাটির

পাত্র পড়েছিল। শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করল—'বউমা, এখানে মাটির পাত্রগুলি জমা করে রেখেছো কেন ?'

বউ বলল—'আপনি রোজ ঠাকুমাকে মাটির পাত্রে খেতে দেন, তাই আমি আপনার জন্য আগে থেকেই মাটির পাত্র জমা করে রাখছি।'

শাশুড়ি বলল—'তুমি আমাকে মাটির পাত্রে খাবার দেবে নাকি ?'

'বাবা বলেছেন যে তোমার শ্বশুরবাড়ির যা নিয়ম তাই করবে।'

'এটা মোটেই নিয়ম নয়।'

'নিয়ম নয় ? তাহলে মাটির পাত্রে কেন খেতে দেন ?'

'থালা কে মাজবে বল ?'

'আমি মেজে দেব।'

'তাহলে এবার থেকে থালাতেই দিও। মাটির পাত্রগুলো বাইরে ফেলে দাও।'

এখন থেকে বুড়ি ঠাকুমা থালাতেই খেতে পেল। সকলের খাওয়া হলে যে খাবার পড়ে থাকত, সেই খুচরো, কাঁকড় শুদ্ধ ভাত-ডাল ঠাকুমাকে দেওয়া হত। বউ তা হাতে নিয়ে দেখত। একদিন শাশুড়ি বলল—'বউমা, কী দেখছ ?'

'আমি দেখছিলাম বড়োদের কেমন খাবার খেতে দিতে হয়।'

'এরকম করে দেওয়াটা কোনো নিয়ম নয়।'

'তাহলে আপনি এমন খাবার ঠাকুমাকে দেন কেন ?'

'আগে আগে কে আর ওঁকে খেতে দেবে ?'

'আপনি বললে আমিই দিয়ে আসতে পারি।'

'ঠিক আছে, তাহলে তুমিই রোজ আগে ওঁকে খেতে দিও।'

'ভালো কথা।' বুড়ি এবার থেকে প্রত্যহ আগেই গরম গরম খাবার পেতে লাগলেন। রান্না হলেই ভাত-ডাল, তরকারি, লুচি ইত্যাদি তাঁকে দিয়ে আসত। বুড়ি ঠাকুমা মনে মনে খুব আশীর্বাদ করতেন। তিনি সারাদিন একটা খাটে শুয়ে থাকতেন। সেই খাটটা ভাঙ্গা ছিল। বউটি একদিন খাটটিকে ভালো করে দেখছিল। শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করল—'কি দেখছ ?' বউ বলল—'দেখছিলাম, বড়োদের কেমন খাট দিতে হয়।'

'এমন খাট দেওয়ার কথা নয়। এটা ভেঙ্গে এমন হয়ে গেছে।'

'তা হলে অন্য একটা কেন আনা হয়নি।'

'তুমি আর একটি এনে দাও।'

'আপনি বললে আমি এনে দিতে পারি।'

ঠাকুমার জন্য সুন্দর চওড়া খাট আনা হল।

একদিন কাপড় কাচার সময় বউটি ঠাকুমার শাড়ি দেখছিল, কাপড়টি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করল—'কি দেখছ ?'

'দেখছিলাম বৃদ্ধদের কেমন কাপড় দিতে হয়।'

'আবার সেই কথা, এরকম কাপড় দিতে হয় নাকি' পুরানো হলে কাপড় এইরকম ছিঁড়ে যায়।

'সে রকম কাপড় রাখা কেন ?'

'তুমি বদলিয়ে দাও।'

এবার বউটি ঠাকুমার কাপড়, চাদর, বিছানা সব বদল করে নতুন সব আনল। তার বুদ্ধিতে বৃদ্ধা ঠাকুমার জীবন বদলে গেল। যদি সেই বউটি শাশুড়িকে উপদেশ দিতে যেত তাহলে শাশুড়ি কি তার কথা শুনত ? তার কোনো প্রভাবই পড়ত না। তাই মেয়েদের উচিত এরূপ বুদ্ধির সঙ্গে সকলের সেবা করে সকলকে খুশি রাখা।

—— ০ ——

এখন ঘোলের জন্য চিন্তা কীসের !

এক রাজকুমার ছিল। একদিন সে কয়েকজন সঙ্গীসাথী নিয়ে ঘোড়ায় করে যাচ্ছিল। পথে কয়েকজন গোয়ালা রমণীকে দেখা গেল যারা দুধ-দই-ঘোল ইত্যাদি বিক্রি করতে যাচ্ছিল। রাজকুমারের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হলো। সে ভাবল, তিনি গোপরমণীদের দুধ-দই-ঘোল চুরি করতেন, আজ আমিও তাই করব। আগে তো মজা করে নিই, পরে ওদের দাম দিয়ে দেব। এইভেবে রাজকুমার আর তার সঙ্গীরা গোয়ালিনীদের হাঁড়িগুলি ভেঙ্গে দিল। বেচারিরা মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন গোয়ালিনী, যার হাঁড়ি ভেঙ্গে ঘোল চর্তুদিকে গড়িয়ে পড়ে গেছে, সে কিন্তু কাঁদছে না, সে শুধু হাসছে। রাজকুমার তাই দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করল—'কি ব্যাপার, তুমি যে

কাঁদছ না ?' সে বলল—'মহারাজ ! আমার কাহিনী অনেক লম্বা। আমি কেন ঘোলের জন্য শোক করব ?' রাজকুমার বলল—'তোমার কাহিনী আমাকে শোনাও।' তখন সেই গোয়ালিনী বলতে আরম্ভ করল—আমি একটি শহরের এক ধনীর পত্নী ছিলাম, আমার একটি বালক পুত্র ছিল। আমার স্বামী ব্যবসার কাজে অন্যত্র গিয়েছিল। আমার শহরের রাজার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল। আমার তখন বয়স কম দেখতেও সুন্দর ছিলাম। রাজার কুদৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল। সে একদিন বলে পাঠাল, তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে, কবে আসবে বল। আমি বললাম—'দাঁড়াও, পরে জানাব।' আমি আমার স্বামীকে তাড়াতাড়ি আসতে লিখলাম, বললাম আমার খুব বিপদ। আমার স্বামী এলে তাকে সব কথা জানালাম, দুজনে পরামর্শ করতে লাগলাম কী করা যায় ! আমার স্বামী বলল যে, রাজাকে আসতে বলো। আমি রাজাকে খবর পাঠালাম যে সে যেন শহরের বাইরে একস্থানে রাত্রে আসে এবং শর্ত দিলাম যে সেই স্থানের এক মাইলের মধ্যে যেন অন্য কেউ না থাকে। রাজা মেনে নিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম, আমার হাতে একটি তলোয়ার ছিল। আমার স্বামী কাছেই একটি ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে রইল। রাজা আসতেই তাকে তলোয়ারের আঘাতে মেরে ফেললাম এবং ছুটে স্বামীর কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার স্বামী মরে পড়ে আছে। বিষাক্ত সাপ ছোবল মেরেছিল। ওখান থেকে আমি পালাতে লাগলাম। কারণ ধরা পড়লে লোকেরা আমাকে মেরে ফেলত। আমার ছেলে পড়ে থাকল।

পালাতে পালাতে আমি এক জঙ্গলে উপস্থিত হলাম, সেখানে ডাকাতের হাতে পড়ি। তারা আমার সব গহনা কেড়ে নিয়ে আমাকে এক গণিকার ঘরে বিক্রী করে দিল। আমি তখন সেখানেই থাকতে লাগলাম। ওখানে যে নতুন রাজা এলো সে আমার ছেলেকে পালন করতে লাগল। বড়ো হয়ে সে ওখানেই চাকরি করতে লাগল। গণিকাদের সঙ্গে থেকে আমিও গণিকা হয়ে গেলাম। কয়েকবছর পর আমার ছেলে গণিকা পল্লীতে এসে আমার সঙ্গে রাত কাটাল। আমার কেমন চেনা মনে হচ্ছিল, সকালে তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে তারা নাম-ধাম সব কিছু জানাল, আরে এতো আমারই ছেলে। আমার মনে তখন বড়ো দুঃখ হলো, ভীষণ গ্লানি হলো, আমি কি ছিলাম,

আজ কোথায় নেমেছি। পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলাম যে এইরূপ পাপ হলে কী করা উচিত। তাঁরা বললেন চিতায় প্রাণ বিসর্জন করা উচিত। মনে ভাবলাম চিতায় পুড়লে আমার নাভি কে গঙ্গায় দেবে ? তাই গঙ্গার তীরে চিতা সাজিয়ে, তাতে আগুন দিয়ে উঠে বসলাম। চিতা জ্বলতে লাগল। এদিকে তখন হঠাৎ বান এসে গেল আর চিতার কাঠের সঙ্গে আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলল। আগুন নিভে গেল, কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে আমি এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। সেই গাঁয়ে গোয়ালারা বাস করত। আমি ওদের জিনিস বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করি। আজ ঘোল নিয়ে এসেছিলাম। ঘোল যদি পড়ে যায় তাহলে আর চিন্তা করব কেন ?

হত্বা নৃপং পতিমবেক্ষ্য ভুজঙ্গদষ্টং
দেশান্তরে বিধিবশাদ্ গণিকাং চ যাত।
পুত্রং প্রতি সমধিগম্য চিতাং প্রবিষ্টা
শোচামি গোপগৃহিণী কথমদ্য তক্রম্॥

'রাজার মৃত্যু হল তার কর্মফলে, স্বামী গেল সাপের কামড়ে।
ডাকাত এসে সব লুটে নিয়ে, বেচে দিল গণিকার ঘরে।
পুত্র এসে রাত কাটাল, চিতায় চড়লাম, মা গঙ্গা বাঁচাতে আবার বাঁচলাম।
রাজকুমার, এখন গোয়ালিনী আমি, সামান্য ঘোলের জন্য কেন চিন্তা করি।'

জীবনে এরকম কত ঘটনাই ঘটেছে, কতরকম দশা হয়েছে, এখন এই সামান্য লোকসানের জন্য চিন্তা করব কেন ? এমন তো হয়েই থাকে। এখন একটু ঘোল পড়েছে তো কি হয়েছে ? আমাদের না জানি কত জন্ম জন্মাতে হয় আর কত রকম দশা পেরোতে হয়। তাতে কখনও ছেলে মরে যায়, কখনও স্বামী, কখনও বউ মরে যায়। কখনও ধনী হতে হয়, কখনও বা গরিব ভিখারি। এরকম কতবার হয়েছে আর গেছে। হাওয়া যখন জোরে বয় তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠে যায়, আবার সব শান্তি। কোথাকার জিনিস কোথায় উড়ে যায়। এ আর নতুন কথা কি ? জগতে সবই আসে আবার চলেও যায়। এসবের জন্য চিন্তা কিসের ?

— ০ —

ভ্রম দূর হয়ে গেল

মুকুন্দদাস নামে এক ব্যক্তি একজন বিখ্যাত সাধুর শিষ্য ছিল। সেই সাধু যখনই মুকুন্দদাসকে তাঁর কাছে ডাকতেন, সে বলত 'আমি না থাকলে আমার স্ত্রী-পুত্র বাঁচবে না, এরা আমার জন্যই বেঁচে আছে। আমি ছাড়া এদের জীবিকা-নির্বাহ হবে কী করে ?' সাধু বলতেন—'বাবা ! এ তোমার ভ্রম, একথা ঠিক নয়।' একদিন তিনি মুকুন্দদাসকে বললেন—'ঠিক আছে, তুমি পরীক্ষা করে দেখো।' সে পরীক্ষা করতে রাজি হল। সাধু তাকে প্রাণায়ামের সাহায্যে নিঃশ্বাস রোধ করা শিখিয়ে দিলেন।

একদিন মুকুন্দদাস তার পরিবারের লোকের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গেল। স্নান করতে করতে সে ডুব দিয়ে নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ করে জলের তলা দিয়ে বহু দূরে জঙ্গলের কাছে গিয়ে উঠল এবং সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে সাধুর কাছে গিয়ে পৌঁছাল।

মুকুন্দদাসের স্ত্রী-পরিজনেরা এদিকে তার অনেক খোঁজ করল। কিন্তু অনেক খুঁজেও যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন তারা ধরে নিল যে সে নদীতে মরে গেছে। সকলেই জানল যে মুকুন্দদাস জলে ডুবে মারা গেছে। তখন সকলে আলোচনা করতে লাগল যে বেচারি মুকুন্দদাস তো মারা গেছে, এখন তার স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। সকলেই যে যার মতো সাহায্য করার কথা বলতে লাগল। কেউ বলল— সে চাল দেবে, কেউ বলল আটা, কেউ আবার বাচ্চাদের স্কুলের ব্যবস্থা করল। একজন বলল তার টাকা-পয়সা তেমন নেই, সে সংসারের কাজে সাহায্য করবে। এইভাবে তারা মুকুন্দদাসের ঘরে চাল-ডাল-আটা-ঘি-চিনি সব একত্র করল। মাসের অন্য খরচের জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থাও করল। এইভাবে মুকুন্দদাস না থাকলেও তার পরিবারের সমস্ত অভাব পূর্ণ হয়ে গেল, এমনকী মুকুন্দদাসের থেকেও ভালো ব্যবস্থা হল।

কিছুদিন পর মুকুন্দদাসের স্ত্রী সাধুর কাছে গেল। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন 'ঘরে সব কেমন আছে, কোনো অসুবিধা নেই তো ?' মুকুন্দদাসের স্ত্রী বলল—'যে ব্যক্তি চলে যায়, তার স্থান তো কখনই পূর্ণ হয় না, তবে আমাদের জীবন আগের থেকে ভালোভাবে চলছে।' সাধু বললেন—

'আগের থেকে ভালো কী করে।' সে বলল—'আপনার কৃপায় আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস দিয়ে যায়, যখনই যা প্রয়োজন, তা আমরা পেয়ে যাই। আমাদের কোনো অভাব নেই।' মুকুন্দদাস ভেতর থেকে লুকিয়ে তাদের সব কথা শুনছিল।

আরো কিছুদিন কেটে গেল। সাধু মুকুন্দদাসকে বললেন—'তুমি একবার তোমার ঘরে যাও।' সে একদিন রাত্রিবেলা তার বাড়িতে গেল। বাইরে থেকে সে দরজার কড়া নাড়ল। তার স্ত্রী ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করল—ওখানে কে ? মুকুন্দদাস বলল—'আমি, দরজা খোল।' তার গলার স্বর শুনে তার বউ ভয় পেয়ে গেল, ভাবল আরে, ও তো মরে গেছে, এটা নিশ্চয়ই ওর ভূত ! সে বলল—'আমি দরজা খুলব না।' মুকুন্দদাস বলল—'আমি তো মরিনি, দরজা খোল।' বউ বলল—'আমার বাচ্চা ছেলেরা দেখে ভয়ে মরে যাবে, তুমি চলে যাও।' মুকুন্দদাস বলল—'আমি না থাকলে তোমাদের কে দেখবে ?' বউ বলল—'সাধুর কৃপায় আগের থেকে আমরা এখন ভালো আছি, তুমি চিন্তা কোরো না, দয়া করে এখান থেকে চলে যাও।' মুকুন্দদাস বলল—'তোমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই তো ?' বউ বলল— 'তুমি এসেছ এটাই দুঃখের। তুমি না এলে আর কোন দুঃখ নেই। দয়া করে তুমি আর এসো না।'

—— ০ ——

বিশিষ্ট অতিথি সৎকার

বিষ্ণুকাঞ্চী নগরে দামোদর নামে এক গরিব ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর বিবাহ হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন—'দেখো, আমরা এখন গৃহস্থ, গৃহস্থের প্রধান কাজ হল অতিথি সৎকার করা। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি কোনো অতিথি যদি আসেন তিনি যেন ক্ষুধা নিয়ে ফিরে না যান। ব্রহ্মচারীর প্রধান ধর্ম হল গুরুর আদেশ পালন করা, গৃহস্থের অতিথি সৎকার করা, বাণপ্রস্থের তপস্যা করা এবং সন্ন্যাসীর ভগবৎ-চিন্তা এবং সাধন ভজন করা।' তার স্ত্রী বলল—'ঠিক আছে।' এই ব্রাহ্মণ কাঞ্চীনগরীতে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতেন এবং তাতে যা পেতেন, তাই তিনি ঘরে ফিরে স্ত্রীকে

দিয়ে দিতেন। তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত সাধারণ ছিল। খাবার জন্য প্রত্যহ অন্নের যোগাড়ও থাকত না।

ভগবান হলেন লীলা পুরুষোত্তম। তাঁর লীলা অতীব বিচিত্র। একদিন ভগবান এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করে সেখানে এলেন। দামোদরের গৃহের বাইরে এসে বললেন—'এখানে দামোদর বলে কেউ থাকে ?' দামোদর ভেতরেই ছিলেন, তিনি বাইরে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলে সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন—'আজ তোমার এখানে ভোজন করার ইচ্ছা হয়েছে।' ব্রাহ্মণ বললেন—'এতো আনন্দের কথা।' তিনি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে ভেতরে নিয়ে এসে বসালেন। দৈবযোগে সেদিনই ব্রাহ্মণ কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করতে পারেননি। তিনি ভাবলেন, 'এবার কী হবে, নিজে না হয় কিছু খাব না কিন্তু মহারাজকে কীকরে ক্ষুধার্ত রাখবো ? ঘরে তো কিছুই নেই, আছে কিছু ছেঁড়া-ফাটা কাপড়-বাসন, ছেঁড়া বিছানা।' তিনি স্ত্রীকে গিয়ে বললেন— 'আজ তো ভারি মুস্কিল হলো, অতিথি ক্ষুধার্ত থাকবেন।' স্ত্রী জবাব দিল— 'তুমি ভাবছ কেন, আমি তো আছি।' ব্রাহ্মণ বললেন—'কেন, তোমার কাছে গহনা আছে নাকি ?' স্ত্রী বলল—'গহনা কোথায় ? কাপড় চোপড়ই ছেঁড়া।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—'তাহলে অতিথি সৎকার করবে কী-করে ?' স্ত্রী বলল—'তুমি এক কাজ কর নাপিতের কাছ থেকে একটা কাঁচি চেয়ে আনো।' ব্রাহ্মণ কাঁচি নিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী নিজের ঘন সুন্দর চুল কাঁচি দিয়ে ভেতর ভেতর থেকে কেটে ফেলল এবং তাই দিয়ে লম্বা একটি দড়ি তৈরী করে ব্রাহ্মণকে দিয়ে বলল সেটি বাজারে গিয়ে বিক্রি করে কিছু কিনে আনতে। ব্রাহ্মণ সেটি বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করলেন এবং তার থেকে যা পয়সা পেল তাইতে চাল-ডাল কিনে নিয়ে এলেন। তাঁর স্ত্রী ডাল-চাল দিয়ে ভাল করে খিচুড়ী রান্না করল। সন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ বললেন— 'মহারাজ ! রান্না হয়ে গেছে, খাবেন আসুন।' মহারাজ খেতে বসলে ব্রাহ্মণ কলা গাছের পাতা আনলেন, তাঁর স্ত্রী খাবার পরিবেশন করল। মহারাজ খেতে আরম্ভ করলেন এবং সমস্ত খাবার খেয়ে নিলেন। ব্রাহ্মণ বললেন— 'মহারাজ, আর একটু নিন।' তিনি বললেন—'আচ্ছা, আর একটু দাও।' যেটুকু খিচুড়ী ছিল বউটি সবটাই সন্ন্যাসীকে দিয়ে দিল। তিনি সবটুকু চেটেপুটে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। খেয়ে উঠে তিনি বললেন—'বাবা, এই বুড়ো

বয়সে এখন আর কোথায় যাব ? এখানেই একটু বিশ্রাম করি।' ব্রাহ্মণ বললেন—'হ্যাঁ, মহারাজ, আপনি এখানেই বিশ্রাম করুন।' মহারাজ সারাদিন সেখানেই থেকে গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় সাধু বললেন—'রাতে আর কোথাও যাব না, বেশি কিছু আয়োজন কোরো না, যাহোক একটু ফুটিয়ে দাও।' ব্রাহ্মণ বললেন—'ঠিক আছে প্রভু।' ব্রাহ্মণের স্ত্রী তার মাথার সব চুলই এবারে কেটে ফেলল আর তাই দিয়ে আবার দড়ি তৈরী করল। ব্রাহ্মণ বাজারে সেটি বিক্রি করে চাল-ডাল আনলেন। তাঁর স্ত্রী রাত্রে সিদ্ধ ভাত ও একটু ডাল করলে সাধু সমস্ত ভাত ডাল দিয়ে পরিষ্কার করে খেলেন। খেয়ে উঠে সাধু বললেন—'এখানেই শুয়ে পড়ি, সকাল হলে চলে যাব।' ব্রাহ্মণ বললেন— 'হ্যাঁ প্রভু এখানেই শুয়ে পড়ুন, আমি বিছানা করে দিচ্ছি।' তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ছেঁড়া মাদুর, তোষক, চাদর সব দিয়ে সুন্দর করে সাধুর জন্য বিছানা করে দিলেন। সাধু শুলে তাঁরা দুজনে দুদিকে বসলেন সাধুর সেবা করতে। একটু পরে সাধু ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ এবং তাঁর স্ত্রীও সাধুর পা টিপতে টিপতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লে সাধু উঠে বসলেন। তিনি এতক্ষণ ঘুমের ভান করে জেগেই ছিলেন। তিনি আশীর্বাদ করলেন যেন ব্রাহ্মণের স্ত্রীর আগের মতোই সুন্দর চুল হয়ে যায়, সুন্দর নতুন শাড়ী ও গহনা হয়, ধন-ধান্যে তাদের ভাঁড়ার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারপর তিনি অন্তর্ধান করেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ঘুম ভেঙ্গে দেখল তার মাথায় ঘন কালো চুল, গা ভর্তি গহনা, সুন্দর রেশমি শাড়ি পরিধান করা। সে খুব অবাক হয়ে স্বামীকে ডেকে তুলল—'দেখো, এসব কী কাণ্ড !' ব্রাহ্মণ ঘুম ভেঙ্গে বৃদ্ধ সাধুকে না দেখে দৌড়ে বাইরে গেলেন, ভাবলেন এই বৃদ্ধ বয়সে এতো সকালে তিনি গেলেন কোথায়। স্ত্রী তাঁকে ডেকে বলল—'আগে দেখো, নিজের দিকে দেখ, ঘরের দিকে দেখ।' ব্রাহ্মণ সব দেখে কাঁদতে লাগলেন—'ভগবান, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনার সেবায় আমি না জানি কত ক্রুটি করে ফেলেছি। আমি কিছুই জানি না প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।' ভগবান প্রকটিত হয়ে বললেন—'তোমাদের সেবায় আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। এখন থেকে তোমরা খুব অতিথি সৎকার করো, পরে এখানকার কাজ শেষ হলে দুজনে আমার ধামে চলে আসবে।'

——— ০ ———

একটি নগরের চারজন সাধু

একটি নগরে চারজন সাধু এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন নগরের চৌমাথায় গিয়ে বসলেন, একজন বসলেন ঘড়িঘরে, অন্য আর একজন গিয়ে বসলেন পুলিশ কাছারিতে আর চতুর্থজন গিয়ে আশ্রয় নিলেন শ্মশানে।

যে সাধু চৌমাথায় বসেছিলেন, তাঁকে লোকে জিজ্ঞাসা করল— 'সাধুজী ! আপনি এই স্থানটিতে এসে বসেছেন কেন ? আপনি কি এর থেকে ভালো আর কোন স্থান পান নি ?' সাধু বললেন—'এখানে চারদিক থেকে লোক আসে এবং চারদিকে চলে যায়। কাউকে যদি ডাকো তাহলে সে বলবে দাঁড়াবার সময় নেই এখন, জরুরি কাজে যেতে হবে। তারা জানে না যে জরুরি কাজ কোন দিকে ? সাংসারিক কাজের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে জীবন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আসলে সে কিছু পায় না। সাংসারিক কাজও সম্পূর্ণভাবে করতে পারে না এবং ভগবানকে ডাকাও হয়ে ওঠে না। আমার সেইজন্যই এই স্থানটি বসবার পক্ষে উত্তম বলে মনে হয়েছে, যাতে আমি সবাইকে সতর্ক করতে পারি।'

ঘড়িঘরে যে সাধু অবস্থান করছিলেন, তাঁকে লোকে জিজ্ঞাসা করল— 'সাধুজী ! আপনি কেন এখানে আসন গ্রহণ করেছেন ?' সাধু উত্তর দিলেন—'ঘড়ির কাঁটা সারাদিন ধরে ঘুরতে থাকে, কিন্তু বারোটা বাজলেই দুহাত জোড় করে বলে, ব্যস্ আমার কাছে এইটুকু সময়ই ছিল, এর থেকে বেশি কোথা থেকে আনব ? ঘন্টা যখন বাজে তখন ঘড়ি যেন বলে তোমার বয়স একঘন্টা বেড়ে গেল ! জীবনের সময়কাল অত্যন্ত সীমিত। প্রতিমুহূর্তে আয়ু কমে মৃত্যু নিকট হচ্ছে। সুতরাং সাবধান হয়ে ভগবদ ভজন ও অন্যের সেবায় সময় কাটানো উচিত। তাই সাধুদের বসার জন্য এই স্থানটিই ঠিক বলে মনে হয়, এতে অন্যকে সতর্ক করে দিতে পারি।'

পুলিশ কাছারীতে যে সাধু বসেছিলেন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল— 'মহারাজ ! আপনি এখানে কেন আশ্রয় নিয়েছেন ?' সাধু বললেন— 'এখানে সারাদিন ধরে অপরাধী আসে এবং পুলিশ তাদের মারে। মানুষ পাপ করে নিজের ইচ্ছায় কিন্তু সাজা পেতে হয় অন্যের ইচ্ছায়। মানুষ যদি পাপ না করে, তাহলে তাকে শাস্তিও পেতে হয় না। তাই সাধুদের আশ্রয় নেওয়ার

জন্য এই স্থানটি ভালো বলে মনে হয়, যাতে অন্যকে সতর্ক করতে পারি।'

শ্মশানে আশ্রয়গ্রহণকারী সাধুকে লোকে জিজ্ঞাসা করল—'মহারাজ ! আপনি এইস্থানে রয়েছেন কেন ?' সাধু বললেন—'কোনো মানুষই চিরদিন বাঁচে না। সবাইকেই একদিন চলে যেতে হয়। এখানে এলে আর মানুষ ফেরে না। কারণ এইস্থানেই তার যাত্রা সমাপ্ত হয়। কোনো মানুষেরই এখানে না এসে উপায় নেই। সুতরাং বেঁচে থাকতে থাকতেই পরমলাভ প্রাপ্তি করা উচিত, যাতে পুনরায় পৃথিবীতে এসে দুঃখ পেতে না হয়। তাই আমার মনে হয়েছে আশ্রয় নেওয়ার পক্ষে এটিই সবথেকে বেশি উপযুক্ত, যাতে সতর্কতা বজায় থাকে।'

—— ◦ ——

চার প্রকার আশীর্বাদ

এক জঙ্গলে একজন শিকারী যাচ্ছিল। পথে ঘোড়ার ওপর এক রাজকুমারের সঙ্গে তার দেখা হল। দুজনে তখন একসঙ্গে যেতে লাগল। কিছুদূরে তাদের সঙ্গে একজন তপস্বী ও একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হল। তারা দুজনও ওদের সঙ্গে চলতে লাগল। চারজন এক গভীর জঙ্গল দিয়ে যেতে যেতে সামনে একটি কুটির দেখতে পেল। সেই কুটিরে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করছিলেন। চারজনে কুটিরের মধ্যে গিয়ে বাবাজীকে প্রণাম করল। সাধুবাবা সেই চারজনকে চার প্রকার আশীর্বাদ দিলেন।

সন্ন্যাসী রাজকুমারকে বললেন—'রাজপুত্র ! তুমি চিরজীবি হও।' তপস্বীকে বললেন—'ঋষিপুত্র ! তুমি আর বেঁচে থেক না।' সাধুকে বললেন—'তুমি বেঁচে থাকতে চাও বেঁচে থাক অথবা মরতে চাও তো মৃত্যুকে বরণ করো, যা তোমার ইচ্ছা।' শিকারীকে বললেন—'তুমি বেঁচেও থেকো না, মরেও যেও না।' আশীর্বাদ দিয়ে সন্ন্যাসী চুপ করলেন। চার ব্যক্তিই সন্ন্যাসীর আশীর্বাদের তাৎপর্য বুঝতে পারল না। তারা তখন তাঁর কাছে অনুরোধ করল তাঁর আশীর্বাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্য।

সন্ন্যাসী বললেন—'রাজাকে নরকে যেতে হয়। মানুষ প্রথমে তপস্যা করে এবং তপের প্রভাবে সে রাজা হয় এবং মৃত্যুর পরে তাকে নরকে যেতে হয়।

তপেশ্বরী রাজেশ্বরী রাজেশ্বরী নরকেশ্বরী। তাই আমি রাজকুমারকে চিরজীবি থাকার আশীর্বাদ করেছি। বেঁচে থাকলে সুখভোগ করবে। তপস্যাকারী বেঁচে থাকলে তপস্যা করে শরীরকে কষ্ট দেয়। তার মৃত্যু হলে সে তপস্যার প্রভাবে স্বর্গে গমন করে অথবা রাজা হয়। তাই তপস্বীকে মরে যাওয়ার আশীর্বাদ করেছি, যাতে সে সুখ পায়। সাধু বেঁচে থাকলে ভজন সাধন করে থাকে, অন্যের উপকার করে আর মৃত্যু হলে ভগবদ্ ধামে যায়। সে বেঁচে থাকলেও আনন্দ, মৃত্যু হলেও আনন্দ পায়। তাই আমি তাকে আশীর্বাদ করেছি যে বেঁচে থাক বা মৃত্যু বরণ কর তা তোমার ইচ্ছা। আর শিকারী সর্বক্ষণ জীবহত্যা করে। সে বেঁচে থাকলেও জীব হত্যা করবে আর মরে গেলে নরকে গমন করবে। তাই ওকে আমি বলেছি তুমি বেঁচেও থেকো না আর মরেও যেও না।

রাজপুত্র চিরংজীব মা জীব ঋষিপুত্রকঃ।
জীব বা মর বা সাধু ব্যাধ মা জীব মা মরঃ॥

মানুষের জীবন এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে বেঁচে থাকলেও আনন্দে থাকে আর মরে গেলেও আনন্দে থাকে। সাধু হতে হলে সাধুর বেশ পরিধান করার প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকেও মানুষ সাধু হতে পারে। ভগবদ্ ভজন করে এবং অন্যের উপকার করে থাকলে ইহজগতেও আনন্দ, অন্যজগতেও আনন্দ লাভ করা যায়। উভয় স্থানই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সন্ত কবীর বলেছেন—

সব জগ ডরপে মরণ সে, মেরে মরণ আনন্দ।
কব মরিয়ে কব ভেটিয়ে, পূরণ পরমানন্দ॥

— ० —

আদেশ পালনের মহিমা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্দীপন মুনির কাছে বিদ্যালাভ করেছিলেন, সন্দীপন তাঁর বিদ্যাগুরু ছিলেন। সন্দীপন মুনি যখন বালক কালে তাঁর গুরুর কাছে পড়াশোনা করতেন তখন তিনি তাঁর গুরুর খুব সেবা করতেন। সকল বিদ্যার্থীদের মধ্যে সন্দীপনের গুরুভক্তি অত্যন্ত বিশিষ্ট ছিল। একবার তাঁর

গুরু সন্দীপনের গুরুভক্তির পরীক্ষা নেওয়ার কথা ভাবলেন। একদিন সব বিদ্যার্থী বাইরে গিয়েছিল। গুরুর একটি বালক পুত্র ছিল, সে বাইরের উঠোনে খেলা করছিল। গুরু যখন দেখলেন বিদ্যার্থীরা বাইরে থেকে ফিরে আসছে, সেইসময় তিনি সন্দীপনকে বললেন তাঁর বালক পুত্রকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিতে। সন্দীপন কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই গুরুর কথামত বালকটিকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। বিদ্যার্থীরা বালকটিকে ফেলতে দেখে দৌড়ে এলো 'আরে, আরে, সন্দীপন গুরুর ছেলেকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে।' কুয়োয় জলভর্তি ছিল, তারা কয়েকজন জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে বাচ্ছাটিকে তুলে আনল এবং কয়েকজন সন্দীপনকে ধরে মারতে লাগল। সন্দীপন চুপচাপ তাদের মার সহ্য করতে লাগলেন কিন্তু একবারও বললেন না যে তিনি গুরুর নির্দেশেই একাজ করেছেন। গুরু কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে বললেন—'ওকে আর মেরো না, তোমাদের গুরুভাই হয়।'

অন্য আর একদিন বিদ্যার্থীরা যখন অন্য কোনো স্থান থেকে ফিরছিল তখন তাদের আসতে দেখে গুরু সন্দীপনকে বললেন তাঁর কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগাতে। সন্দীপন তৎক্ষণাৎ আগুন লাগিয়ে দিলেন। বিদ্যার্থীরা দূর থেকে দেখে দৌড়ে এসে আগে আগুন নেভালো, তারপর সন্দীপনকে ধরে মারতে লাগল। সন্দীপন এবারও কিছু বললেন না চুপ করে মার খেতে লাগলেন। গুরু এসে তাদের মারতে নিষেধ করলেন।

সন্দীপন তেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না কিন্তু নির্বুদ্ধিও নন, তিনি মাঝারি বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি গুরুর নির্দেশ কোনো প্রশ্ন না করেই তৎক্ষণাৎ পালন করতেন। মহাপুরুষদের সবথেকে বড়ো সেবা হল তাঁদের নির্দেশ পালন করা। তাঁদের আদেশ পালন করলে তাঁদের শক্তি আমাদের মধ্যে এসে যায়। সেই শক্তি তখনই আসে যদি সেই নির্দেশ তৎক্ষণাৎ পালন করা হয়। আদেশ পালনে দেরি করলে তার শক্তিও কমতে থাকে। সন্দীপন তাই গুরুর আদেশ সঙ্গে সঙ্গেই পালন করতেন অর্থাৎ বিচার বিবেচনা না করেই কাজটি করতেন।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে বিদ্যার্থীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল। তাদের মধ্যে কেউ বড়ো পণ্ডিত হল, সন্দীপনও চলে গেলেন। কিছুদিন পরে তাঁদের গুরু

অসুস্থ হলেন। সেই খবর পেয়ে শিষ্যেরা তাঁকে দেখতে এলো। গুরুর দেহত্যাগের সময় এলে তিনি তাঁর অর্জিত দ্রব্যসমূহ শিষ্যদের দিতে থাকলেন। কাউকে দিলেন পঞ্চপাত্র, কাউকে আচমনের পাত্র, কাউকে আসন, কাউকে মালা। সকলেই গুরুর আশীর্বাদ বস্তু সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করল। সন্দীপন যখন এলেন গুরুজী চুপ করে রইলেন, পরে বললেন—'বাবা তোমায় কি দেব ? দেবার কিছুই নেই। তোমার যা গুরুভক্তি, তার তুল্য দেবার কিছু নেই। তবে আমি আশীর্বাদ করছি যে ত্রিলোকের নাথ ভগবান তোমার শিষ্য হবেন।'

পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সন্দীপন গুরুরই শিষ্য হয়েছিলেন।

——— ০ ———

বিশিষ্ট সাধনা

শবর জাতির এক অতি সাধারণ মেয়ে শবরী। শবর জাতির মানুষেরা সাধারণত কুরূপ হয়। তাদের মধ্যে শবরী এতোই কুশ্রী ছিল যে শবরজাতির মধ্যেও কোনো পুরুষ তাকে বিয়ে করতে রাজি ছিল না। মা-বাবা অত্যন্ত চিন্তিত ছিল যে কীভাবে তারা মেয়ের বিয়ে দেবে ! অনেক অনুসন্ধানের পর শবরজাতির একটি ছেলে পাওয়া গেলে শবরীর বিয়ে ঠিক হলো। শবরীর মা-বাবা বিবাহ সম্পন্ন করে রাত্রের মধ্যেই তাদের রওনা করিয়ে দিল, যাতে ছেলেটি অন্ধকারে শবরীকে ভালোভাবে দেখতে না পায়। ছেলেটি শবরীকে নিয়ে সেই অন্ধকারেই রওনা হলো, আগে ছেলেটি চলতে লাগল, পিছনে শবরী। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা দণ্ডকবনে এসে পৌঁছাল। ক্রমশ ভোর হয়ে সূর্যোদয় হল। ছেলেটি ভাবল রাত্রে বৌকে ভালো করে দেখতে পাইনি, এখন একবার দেখিতো, আমার বউ কেমন দেখতে ! সে পিছন ফিরে শবরীকে দেখে আঁতকে উঠল, সে ভাবল এতো কুৎসিৎ, এ নিশ্চয়ই মানুষ নয়, কোন ডাকিনী বা রাক্ষসী হবে, আমাকে মেরে ফেলবে। এই ভেবে সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চম্পট দিল। বেচারি শবরী একলা সেই দণ্ডকবনে পড়ে রইল। সে তার পিতৃগৃহ থেকে এতো দূরে চলে এসেছিল যে পথ কোথায় তা-ও জানত না। কাজেই কোথায়ই বা সে যাবে ?

দণ্ডকবনে যে সব মুনি ঋষিরা থাকতেন তাঁরা শবরীকে অচ্ছুৎ জেনে

গালিগালাজ করতেন এবং তার ছায়া মাড়াতেন না। সেই বনেই মতঙ্গ নামে একজন বৃদ্ধ ঋষি থাকতেন, শবরীকে দেখে তাঁর মনে করুণা হলো। তিনি কৃপা করে শবরীকে তাঁর আশ্রমে থাকতে দিলেন। অন্য ঋষিরা এই নিয়ে অনেক আপত্তি করলেও মতঙ্গ ঋষি তাঁদের কোন কথা শুনলেন না। উনি অত্যন্ত স্নেহসহকারে শবরীকে বললেন—'মা ! তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি, তুমি আমার কাছেই থাকবে।' বাবার কাছে যেমন সন্তান আদরের সঙ্গে থাকে, শবরীও তেমনই মতঙ্গ ঋষির কাছে সাদরে স্থান পেল।

শবরী মানুষের সেবা করতে খুব ভালবাসত । অন্যান্য মুনি ঋষিরা শবরীকে দেখলে গালমন্দ করলেও সে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের সব কাজ করে দিত। রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ত, তখন শবরী চুপি চুপি উঠে, যে রাস্তা দিয়ে মুনিরা পম্পা সরোবরে স্নান করতে যেতেন, সেই রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে রাখত। যেখানে কাঁকর ইঁটের টুকরো পড়ে থাকত, সেখানে ঝুড়ি করে বালি এনে বিছিয়ে দিত, যাতে কারো পায়ে ব্যথা না লাগে। ঋষিদের যজ্ঞ করার এবং রান্না করার জন্য কাঠ-কুটো জড়ো করে রাখত। কেউ দেখতে পেলে সে পালিয়ে যেত। শবরী ভয় পেত এই ভেবে যে তাকে দেখলে বা ছুঁলে ঋষিরা হয়তো অশুচি হয়ে যাবেন। এইভাবে মুনি ঋষির সেবা করে তার দিন কাটতে লাগল। অবশেষে সেই দিনটি এলো যা সকলেরই অনিবার্য। মতঙ্গ ঋষির দেহত্যাগের সময় হলো। মা-বাবার মৃত্যুর সময় যেমন সন্তান অধীর হয়ে কাঁদতে থাকে, শবরীও মতঙ্গ ঋষির মৃত্যুর কথা শুনে কাঁদতে লাগল, বেচারির আর তো কেউ নেই ! মতঙ্গ ঋষি বললেন—'মা, তুমি চিন্তা কোরো না। একদিন ভগবান রাম তোমার কাছে আসবেন।' তারপর তিনি দেহত্যাগ করলেন।

শবরী তারপর ভগবান রামের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। প্রতীক্ষা খুব উচ্চস্তরের সাধনা। এতে ভগবানের বিশেষ চিন্তা করা হয়। ভগবানের সাধন-ভজন করা এতো সজীব নয়, প্রতীক্ষা যতো সজীব সাধনা। রাত্রে কোনো জন্তু-জানোয়ার জঙ্গল দিয়ে চলে গেলে সেই শব্দকে ভগবান রামের মনে করে বাইরে গিয়ে দেখতো। প্রতিদিন শবরী কুটিরের সামনে ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখত আর নানারকম সুমিষ্ট ফল এনে রাখত। ফলগুলি আবার নিজে চেখে দেখত সেগুলি রসাল এবং সুমিষ্ট কিনা ! সেইদিন রাম না এলে

আবার পরদিন তাজা ফল এনে রাখত। তার মনে খুব উৎসাহ ছিল যে রাম এলে তাঁকে ফল মূল আহার করাবে।

এইভাবে প্রতীক্ষা করতে করতে অবশেষে শবরীর প্রতীক্ষার অবসান হলো। মতঙ্গ মুনির বাক্য সত্য হলো, ভগবান রাম শবরীর কুটিরে পদার্পণ করলেন—

সবরী দেখি রাম গৃহঁ আএ। মুনি কে বচন সমুঝি জিয়ঁ ভাএ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩৪।৩)

অন্যান্য বড় বড় মুনি ঋষি প্রার্থনা করতে লাগলেন যেন রাম তাঁদের কুটিরে আসেন। কিন্তু ভগবান রাম বললেন তিনি শবরীর কুটিরে যাবেন।

মোটা মোটা মুনিনা আশ্রম মুকীনে,
সবরী নে ঘের জায় ছে রে,
বালো ভগতী তণে বশ থায় ছে রে।

শবরীর মনে যেমন ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভগবানের মনেও তেমনই শবরীর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ ছিল। ভগবানের স্বভাবই হলো যে তাঁকে যে যেমন ভাবে ভজনা করে, তিনিও তাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করে থাকেন—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্**' (গীতা ৪।১১)।

শবরীর আনন্দের সীমা থাকল না। সে ভগবানের পদপ্রান্তে গিয়ে পড়ল। ঘটি করে জল এনে শ্রীরামের চরণ ধুয়ে দিল আর সুন্দর আসন পেতে তাঁকে বসাল। তারপর ফল এনে নিজের হাতে ভগবানকে ফল খাওয়াতে লাগল। শবরী দেখতে খুবই দীর্ঘাকৃত, তুলনায় রাম যেন ছোট ছেলে। মা যেমন তার সন্তানকে নিজ হাতে খাইয়ে দেয়, শবরীও তেমনই আদর করে রামকে ফল খাওয়াতে লাগল আর রামও অত্যন্ত আনন্দ ও প্রীতি সহকারে সেই ফল খেতে লাগলেন----

কন্দ মূল ফল সুরস অতি দিএ রাম কহুঁ আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খাএ বারংবার বখানি॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩৪)

এইভাবে শবরীর বিশিষ্ট সাধনা পূরণ হলো।

——— ০ ———

হট্টগোল কোরো না

এক রাজা ছিলেন, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান হয়েছিল। একদিন তিনি রাজ দরবারে মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ যদি কোন দুর্লভ বস্তু পায়, তাহলে সে কি করবে ?' কোনো এক মন্ত্রী বলল—সেটি লুকিয়ে রাখা উচিত, কেউ বলল—সুরক্ষিত স্থানে রাখা উচিত, কেউ বলল—সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা উচিত, ইত্যাদি। কিন্তু মন্ত্রীদের বলা কোনো উত্তরই রাজার মনঃপুত হলো না। তিনি নিজ রাজ্যে ঘোষণা করলেন যে—আমার কথার উত্তর যদি কারো জানা থাকে, সে যেন এসে আমাকে বলে যায় । রাজ্যের নানা লোক এসে রাজাকে তাদের নিজের নিজের উত্তর জানিয়ে গেল, কিন্তু কারো উত্তরই রাজার কাছে সন্তোষজনক ছিল না।

সেই রাজ্যে একজন বেণে বাস করতেন। তাঁরও তত্ত্বজ্ঞান হয়েছিল। তিনি এক রাজপুরুষের মুখে রাজাকে বলে পাঠালেন যে কেউ কোনো দুর্লভ বস্তু পেলে তার সেটি নিয়ে হৈ চৈ করা উচিত নয়, চুপ করে থাকা উচিত। এই কথা শুনে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, বেণে ঠিকই বলেছেন। রাজা বললেন তিনি নিজে বেণের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

বেণের কাছে খবর হলো যে রাজা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। নির্দিষ্ট সময়ে রাজা এলেন। বেণের ঘর অত্যন্ত সাধারণ, তিনি রাজাকে বসার জন্য চটের থলি পেতে দিলেন। রাজা তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা করলেন, পরে তিনি বেণেকে বললেন—'তোমার কি চাই বলো, তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব।' বেণে বললেন—'তাহলে এরপরে না ডাকলে আপনি আর আসবেন না এবং আমাকেও আপনার সঙ্গে দেখা করতে ডাকবেন না।' রাজা ভেবেছিলেন যে বেণে বড় বেশি হলে তাঁর রাজ্যটাই চাইবে, এর থেকে বেশি আর কি চাইতে পারে ! কিন্তু বেণের উত্তর শুনে তিনি খুব অবাক হলেন। তিনি বললেন—'তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।' বেণে বললেন—'মহারাজ ! আমি আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে অথবা আমাকে ডাকতে বারণ করেছি, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব না—এমন কথা বলিনি। আপনাকে বারণ করেছি এইজন্য যে, লোকের মধ্যে প্রচার হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। তখন লোকে আমায় বিরক্ত করবে।

কেউ বলবে, আমার এই কাজটা করিয়ে দাও, কেউ বলবে, রাজাকে বলে আমার একটা চাকরি দাও, কেউ বলবে, আমার শাস্তি রদ করিয়ে দাও—এক নতুন ঝামেলার সৃষ্টি হবে ! তাই আপনিও আসবেন না আর আমাকে ডাকবেনও না। কিন্তু আমার যখনই ইচ্ছা হবে আমি তখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে আপত্তি করিনি। প্রকৃতপক্ষে এখন আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমারও আপনার সঙ্গে কোনো প্রয়োজন নেই।'

——— ० ———

জগতের প্রীতি

এক ব্যক্তি একজন সাধুর কাছে সৎসঙ্গ করার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করত। কিছু দিন পরে সেই ব্যক্তিটির বিবাহ হলো। বিয়ের পরে তার সৎসঙ্গে যাওয়া আসা কমে গেল। যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সৎসঙ্গে যাওয়া তার একেবারেই কম হয়ে গেল। কদাচিৎ সে সাধুর আশ্রমে যাওয়ার সময় পেত। সে একদিন সাধুর কাছে গেলে সাধু বললেন—'তুমি কয়েকদিন আমার আশ্রমে এসে থাক আর সৎসঙ্গ কর।' সে বলল—আমার স্ত্রী আমাকে খুব ভালোবাসে, আমাকে ছেড়ে ও থাকতে পারে না। আমি কেমন করে এসে থাকব ? সাধু বললেন—এ তোমার ভ্রম, একথা ঠিক নয়। কিন্তু লোকটি তা বিশ্বাস করল না। তখন সাধু বললেন—আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না তো, ঠিক আছে, তুমি পরীক্ষা করে দেখ। লোকটি তাতে রাজি হলো। তখন সাধু তাকে প্রাণায়ামের সাহায্যে শ্বাসরোধ করে রাখার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিলেন এবং কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলেন।

একদিন সকালে ঐ ব্যক্তিটি তার স্ত্রীকে বলল—আজ পায়েস আর লাড্ডু তৈরি কর। আজ আমরা সকলে পায়েস আর লাড্ডু খাব। তার স্ত্রী খুব যত্ন সহকারে পায়েস ও লাড্ডু তৈরি করল। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর লোকটি বলল—আমার পেটে খুব ব্যথা করছে। বৌটি বলল—খাটে শুয়ে পড়। সে খাটে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে সে প্রাণায়ামের সাহায্যে নিজের শ্বাস বন্ধ করে রাখল। তার স্ত্রী এসে দেখল তার স্বামীর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বৌটি ভাবল—আমার স্বামী তো মারা গেছে, এখন কি হবে ! সে তখন চিন্তা করে

দেখল অনেক পায়েস আর লাড্ডু তৈরি হয়ে পড়ে আছে। লাড্ডু তো কিছুদিন থাকবে, কিন্তু পায়েসটা খারাপ হয়ে যাবে। আমি যদি এখনই কান্নাকাটি শুরু করে দিই, তাহলে প্রতিবেশীরা এসে পড়লে পায়েস পড়ে থাকবে। তাই সে দরজা-জানালা বন্ধ করে বাচ্চাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি পায়েস খেয়ে নিল আর লাড্ডুগুলো কৌটায় বন্ধ করে রাখল। তারপরে দরজা খুলে স্বামীর পাশে বসে কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগল—

সাঁঈ স্বর্গ পধার্য়া, কুছ মৈন্ বী আখো !

আমার পতিদেব স্বর্গে গেছে, এখন আমার কি হবে বলো !

এদিকে তার স্বামী উঠে বসেছে, সে তখন বলল—

খীর লবালব পা গয়ী, কুছ পিন্নী বী চক্খা !

পায়েস তো খুব আরাম করে খেয়েছো, এবার কিছু লাড্ডুও খেয়ে নাও, ওটা আর বাকি থাকে কেন ?

———— ০ ————

(একটি) কথার দাম একশ টাকা

এক জমিদার ছিলেন, তিনি খুব ধার্মিক ও মর্যাদাবান পুরুষ ছিলেন। এক দিন এক বৃদ্ধ পণ্ডিত সেইখানে এলেন। তাঁকে দেখে জমিদারের মনে খুব শ্রদ্ধা হলো। তিনি অত্যন্ত সমাদর সহকারে তাঁকে বসালেন এবং অনুরোধ করলেন যে তাঁকে কিছু উত্তম পরামর্শ দেবার জন্য। পণ্ডিত বললেন তিনি উত্তম পরামর্শ দেবেন কিন্তু তারজন্য তাঁকে মূল্য দিতে হবে। এক একটি পরামর্শের জন্য একশ টাকা করে দিতে হবে। জমিদার বললেন—ঠিক আছে আপনি বলুন, আমি টাকা দিয়ে দেব। পণ্ডিত বললেন—‘ছোটো মানুষ যদি বড় হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে বড় বলেই মানা উচিত, ছোটো মনে করা উচিত নয়।’ জমিদার তাঁর নায়েবকে বললেন পণ্ডিতমশায়কে একশ টাকা দিতে। নায়েব একশ টাকা দিয়ে দিলেন। জমিদার বললেন—আর কিছু বলুন। পণ্ডিত বললেন—‘অন্যের দোষ প্রকাশ করা উচিত নয়।’ জমিদারের কথায় নায়েব এই পরামর্শের জন্য পণ্ডিতকে আরও একশ টাকা দিলেন। জমিদার বললেন—আরও কিছু বলুন। পণ্ডিত বললেন—‘যে কাজ চাকরের দ্বারা করানো যায়, সেই কাজে নিজের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।’ নায়েব এই কথার জন্যও একশ টাকা দিলেন। জমিদার বললেন—আরও একটা পরামর্শ

দিন। পণ্ডিত বললেন—'যেখানে এক বার মন বাধা পায়, সেখানে আর থাকা উচিত নয়।' জমিদার এই কথার জন্যও পণ্ডিতমশাইকে একশ টাকা দেওয়ালেন। পণ্ডিত টাকা নিয়ে প্রস্থান করলেন। জমিদার এই চারটি পরামর্শ মনে করে রাখলেন এবং গৃহের নানা স্থানে লিখে রাখলেন।

কিছুদিন পর থেকে জমিদারের আয়ে ঘাটতি হতে থাকল এবং পরে পরিস্থিতি এমন হলো যে তাঁকে তাঁর স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হলো। তাঁর সঙ্গে নায়েবও ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা অন্য এক শহরে গিয়ে পৌঁছলেন। জমিদার তাঁর নায়েবকে শহরে পাঠালেন কিছু খাবার কিনে আনার জন্য। দৈবাৎ সেই শহরের রাজার মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। সেখানকার লোকেরা ঠিক করেছিল যে সেইদিন যে ব্যক্তি শহরে প্রবেশ করবে, তাকেই তারা রাজার সিংহাসনে বসাবে। নায়েব শহরে প্রবেশ করতেই শহরের লোকেরা তাঁকে হাতির পিঠে বসিয়ে মহাধুমধাম সহকারে প্রাসাদে নিয়ে গেল এবং রাজসিংহাসনে বসাল।

এদিকে জমিদার নায়েবের অপেক্ষায় পথ চেয়েছিলেন। যখন অনেক বেলা হয়ে গেল তখন তিনি নিজেই নায়েবকে খুঁজতে শহরে এলেন। শহরে এসে জানতে পারলেন যে নায়েবকে এখানকার রাজা করা হয়েছে। জমিদার তখন রাজপ্রাসাদে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। নায়েব তাঁকে সমস্ত কথা আদ্যোপ্রান্ত জানালেন। জমিদারের পণ্ডিতের পরামর্শ মনে পড়ল, তিনি বলেছিলেন যে 'ছোটো মানুষ যদি বড় হয়ে ওঠে তাহলে তাকে বড় বলেই মানা উচিত, ছোটো বলে ভাবা ঠিক নয়।' জমিদার নায়েবকে প্রণাম করলেন। রাজা তাঁকে মন্ত্রী করে নিজের কাছেই রাখলেন।

রাজার ঘোড়াশালের যে অধ্যক্ষ ছিল, তাঁর সঙ্গে রাণীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। একদিন হঠাৎ জমিদার রাণীকে সেই অধ্যক্ষের সঙ্গে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখে ফেলেন। দুজনেই তখন নিদ্রামগ্ন ছিল। জমিদারের পণ্ডিতের পরামর্শ স্মরণ হলো যে, 'অপরের দোষ কখনও প্রকাশ করবে না।' জমিদার ওদের শয়নের স্থানে একটি দড়ি টাঙ্গিয়ে তার ওপর নিজের গায়ের শালটি চাপিয়ে দিল, যাতে অন্য কেউ না দেখে ফেলে। রাণীর ঘুম ভাঙ্গলে সে দড়ির ওপর শাল দেখতে পেল। রাণী তখন খোঁজ করতে লাগল যে এই শাল কার। পরে জানতে পারল যে এটি মন্ত্রীর (জমিদারের) শাল। সে মনে ভাবল যে মন্ত্রী তো তাহলে রাজাকে সবকথা বলে দেবে, কেননা রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর খুব

ঘনিষ্ঠতা। সে ভাবল অতএব আমাকে এমন কিছু করতে হবে, যাতে সে নিজেই ফাঁদে পড়ে যায়। রাণী এইরূপ চিন্তা করে শালটিকে নিয়ে রাজার কাছে গেল এবং বলল—কাল রাতে আপনার মন্ত্রী অসদ্ উদ্দেশ্যে আমার ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু আমার জন্য তার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আমার ভয়ে সে যখন দৌড়ে চলে যাচ্ছিল, আমি তখন তার শালটা কেড়ে নিয়েছিলাম। এই দেখুন, এই সেই শাল ! রাজা শাল দেখে চিনতে পারলেন, কেননা তিনি যখন জমিদারের নায়েব ছিলেন তখন তিনিই এই শালটি কিনে এনেছিলেন। রাণীর সাজানো মিথ্যা কথায় রাজা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে তার পরামর্শে জমিদারকে মেরে ফেলার কথা ভাবলেন।

পরের দিন রাজা জমিদারকে কসাইয়ের কাছ থেকে মাংস কিনে আনতে বললেন। এদিকে কসাইকে আগে থেকেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি তোমার কাছে মাংস কিনতে আসবে, তাকে মেরে ফেলবে। জমিদার খুব অবাক হয়ে গেলেন। কেননা তিনি কোনোদিন মাংস ছোঁনই না, তাহলে রাজা তাঁকে মাংস আনতে বললেন কেন ? এতে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। জমিদারের সেই বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথা স্মরণ হলো যে 'যে কাজ চাকরের দ্বারা করা সম্ভব, তাতে নিজের সময় নষ্ট করবে না।' তাই জমিদার মাংস আনতে চাকরকে পাঠালেন। কসাই তাকে হত্যা করল। এদিকে রাজার গুপ্তচরেরা ঘোড়াশালের অধ্যক্ষের সঙ্গে রাণীর অবৈধ সম্পর্কের কথা রাজাকে জানিয়ে দিল। রাজার তখন খুব অনুতাপ হলো যে, 'রাণীর কথায় আমি এইরকম বিশ্বাসী মন্ত্রীকে হারালাম।' পরে তিনি জানতে পারলেন যে মন্ত্রী বেঁচে আছেন। তিনি গোপনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শাল রাণীর কাছে কিকরে গেল ? জমিদার বললেন—'পণ্ডিতজীর বলা চারশো টাকা দামের চারটি উপদেশ তো আপনি জানেন, আমি সেই কথাই মেনে চলেছি। রাণী ঘোড়াশালের অধ্যক্ষের সঙ্গে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। আমি পণ্ডিতের কথা স্মরণ করে অন্যের দোষ প্রকটিত করতে চাইনি। তাই তাদের দোষ ঢাকার জন্য শাল চাপা দিয়েছিলাম। সেই শালই তুলে নিয়ে রাণী আপনাকে দেখিয়েছিলেন।' রাজা তখন জমিদারকে অনুরোধ করলেন যে, 'আপনি আপনার মন্ত্রীপদ পুনরায় গ্রহণ করুন।' জমিদার পণ্ডিতের আর একটি উপদেশ স্মরণ হলো যে 'যেখানে একবার আপনার মন ভেঙ্গে যায়, সেখানে আর থাকা উচিত

নয়।' জমিদার বললেন—আমি আর এখানে থাকব না, অন্য স্থানে চলে যাব। রাজা তাঁকে আটকাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু জমিদার তাঁর কথা না শুনে সেখান থেকে চলে গেলেন।

—— ০ ——

বললেই মরবে !

এক রাজা ছিলেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। একবার নগরে এক মস্ত বড় সন্ন্যাসী এসেছিলেন। রাজা তার কাছে গিয়ে সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। সন্ন্যাসী বললেন—মহারাজ ! তোমার প্রারব্ধে কোনো সন্তান নেই। আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ফিরে চললেন। পথিমধ্যে তাঁর সঙ্গে একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হল, ইনি সেই বড় সাধুরই শিষ্য। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ ! আপনি এখানে কোথায় এসেছেন ? মহারাজ বললেন—আমি সন্তানের আশায় এখানে এসেছিলাম, কিন্তু কিছুই হলো না। সাধু বলে ফেললেন—চিন্তা করবেন না, আপনার সন্তান হবে। রাজা আনন্দিত মনে প্রাসাদে ফিরে এলেন। এদিকে সেই সাধুর গুরু বড় সন্ন্যাসী সবকিছু জানতে পেরে শিষ্যের ওপর খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—রাজার ভাগ্যে সন্তান প্রাপ্তির কোনো যোগ নেই, তুমি কেন ওঁকে আশ্বাস দিলে সন্তান হবে বলে ? শিষ্য বললেন—কি করব প্রভু, রাজার বিষণ্ণ মুখ দেখে আমি বলে ফেলেছি। সন্ন্যাসী বললেন—তোমার নিজের কথা সত্য করার জন্য তোমাকেই রাজার ঘরে তাঁর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

কিছুকাল পরে রাজার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটি সর্বসুলক্ষণ সম্পন্ন ছিল, কিন্তু তার একটি দোষ ছিল সে কথা বলতে পারত না। রাজা অনেক বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখালেন, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। রাজা ঘোষণা করে দিলেন যে, যে ব্যক্তি রাজকুমারকে কথা বলাতে সক্ষম হবে তাকে এক লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হবে। বহুলোক এল রাজকুমারের চিকিৎসা করতে, নানারকম ঔষধ দিল, কিন্তু কেউই রাজকুমারকে কথা বলাতে পারল না।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। রাজকুমার বড় হতে লাগল। একদিন রাজকুমারকে নিয়ে রাজার লোকেরা বনে বেড়াতে গেল। সেখানে গিয়ে

তারা দেখল একজন শিকারী শিকারের আশায় বসে আছে। সে পাখির খোঁজ করছিল, পাখি দেখলে সেটি মেরে সে বাজারে বিক্রী করবে। এইসময় গাছের ডালে এক পাখি ডেকে উঠল। শিকারী সেই ডাক শুনে পাখিটিকে দেখতে পেল এবং তৎক্ষণাৎ সেটিকে মেরে ফেলল। তাই দেখে রাজকুমার বলে উঠল—'কথা বলেই মরল'। এই কথা শুনে রাজকুমারের সঙ্গে আসা রাজ অনুচর অত্যন্ত আনন্দিত হলো যে রাজকুমার আজ কথা বলেছে। সে দৌড়ে রাজার কাছে গিয়ে খবর দিল যে বনের মধ্যে রাজকুমার আজ কথা বলেছে। রাজা বললেন—'আমার সামনে বলাও, তাহলেই আমি বিশ্বাস করব।' রাজ অনুচরেরা অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু রাজকুমার চুপ করেই থাকল, কোন কথা বলল না। তখন রাজা বললেন—'তোমরা মিথ্যা কথা বলছ, আমি তোমাদের ফাঁসিতে ঝোলাব।' এই কথা শুনে রাজকুমার আবার বলে উঠল—'কথা বলেই মরল।' রাজা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি রাজকুমারকে অনুরোধ করলেন যে 'ঠিক করে বলো, তুমি কি বলতে চাও।' তখন রাজকুমার বলল—'আমি সেই সাধু যে আপনাকে বলেছিল আপনার সন্তান হবে। আপনার কপালে সন্তান ছিল না, কিন্তু আমি বলে ফেলেছিলাম। সেইজন্য আমাকে আপনার গৃহে জন্ম নিতে হল ! আমি যদি কথাটি না বলতাম, তাহলে আমাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হত না। পাখিটিও কথা বলল, তাই শিকারী তাকে মেরে ফেলল। এই অনুচরেরা আপনাকে আমার কথা বলার খবর দিয়েছে, সেইজন্য এদেরও মৃত্যুর হুকুম হয়েছে। এই সবই কথা বলার পরিণাম। তাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল যে 'কথা বললেই মরবে।' এখন আমি চললাম ; কারণ আমিও কথা বলে ফেলেছি। এই বলে রাজকুমার মৃত্যুর কোলে শয়ন করল। সন্ন্যাসী ঠিকই বলেছিলেন—

জনহরিয়া সংসার মেঁ, বহু বোল্যাং বহু দুক্খ।
চুপ রহিয়ে হরি সুমিরিয়ে, জো জিব চাহে সুক্খ॥

জনবহুল এই পৃথিবীতে যারা বহু কথা বলে তাদের বহু দুঃখ, চুপ করে থাক, যদি জীবনে সুখের আশা রাখ।

—— ० ——

ত্যাগের আদর্শ

(সত্য ঘটনাবলী)

বদ্রীনারায়ণে এক সাধুর আঙ্গুলে ক্ষত হয়েছিল। একজন তাঁকে বলল যে

এখানে কাছেই হাসপাতাল আছে, সেখানে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়। আপনি সেখানে গিয়ে ক্ষততে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিন। সাধু উত্তর দিলেন— ক্ষতের পীড়া আমি সহ্য করে নেব, কিন্তু কাউকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বলব— সেই দুঃখ সহ্য করতে পারব না।

* * *

এক সাধু ছিলেন, তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল 'আপনার কাছে তো একটিও পয়সা নেই তাহলে আপনি খাবার কোথায় পান ?' সাধু বললেন— 'ভিক্ষা করে খাই।' লোকটি জিজ্ঞাসা করল—'যখন ভিক্ষা না পান তখন কি করেন ?' সাধু বললেন—'তখন ক্ষুধাকেই গ্রহণ করি।' ক্ষুধা গ্রহণ করার অর্থ হল আজ আমি খাদ্যগ্রহণ করব না ; ক্ষুধাকেই খেয়ে নিয়েছি।

* * *

এক ভদ্রলোক একদিন সাইকেলে চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাইকেল রাস্তার মাঝখান দিয়ে চালাচ্ছিলেন। পিছন থেকে এক ট্রাক আসছিল, ড্রাইভার ট্রাক থামিয়ে সাইকেল চালককে বলল—'এই ! রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছ কেন ? হয় এদিকে যাও, নাহলে ওদিকে !' ভদ্রলোকের মনে চৈতন্য জাগ্রত হলো যে, 'আরে, আমি তো মাঝপথ ধরে চলেছি অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রাপ্তির একমাত্র লক্ষ্য স্থির না করে জাগতিক বিষয়কেই আশ্রয় করে রেখেছি, এবার আমাকে একদিকে সরে যেতে হবে।' তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

* * *

এক সাধু ছিলেন, তিনি কারো কাছে কিছু চাইতেন না। শুধু তাই নয় কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করত 'কিছু খাবার নেবেন ?' তাহলে তিনি সোজা 'না' বলে দিতেন। তিনি দু তিন দিন খেতে না পেলেও নিতেন না। তবে কেউ যদি তাঁর সামনে খাবার রেখে যেত, তাহলে তিনি সেই খাবার গ্রহণ করতেন।

* * *

ঋষিকেশে একবার এক সাধু কুটিরের বাইরে কোন কাজে বেরিয়েছিলেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর কুটিরে ঠাণ্ডা পানীয় তৈরির সামগ্রী রেখে গিয়েছিল। সাধু ফিরে এসে সেইসব জিনিস দেখে কুটিরের মধ্যে আর প্রবেশ করলেন না। বাইরেই বসে রইলেন, যতক্ষণ না পিঁপড়ে এবং অন্য কীট পতঙ্গ এসে সেগুলি খেয়ে শেষ করে গেল। তারা সেগুলি শেষ করলে তারপর সাধু তাঁর কুটিরে ঢুকলেন।

* * *

ঋষিকেশের প্রসিদ্ধ সাধু শ্রীস্বয়ংজ্যোতি মহারাজের ছেঁড়া বসন দেখে একজন সাধু সূচ-সুতো নিয়ে এলেন। মহারাজ তাঁকে বললেন সূঁচ-সুতো সেখানেই রেখে যেতে, তিনি নিজেই সেটি সেলাই করে নেবেন। পরদিন সাধুটি

এলে মহারাজ তাঁকে সূঁচ-সুতো ফিরিয়ে দিলেন। তখন সাধুটি বললেন—'এটি রেখে দিন, আবার যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তাই সূঁচ-সুতো কাছে রাখা উচিত।' মহারাজ বললেন এই 'চাই'য়ের প্রয়োজন দূর করতেই আমি সব ত্যাগ করে জঙ্গলে বসবাস করছি। আপনি এগুলি নিয়ে যান। আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই।

* * *

এক সন্ন্যাসী একবার মেলায় তাঁর স্ত্রীকে দেখে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—'তুমি এখানে কখন এলে ?' তাঁর স্ত্রী বললেন—'আপনি তো সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, এখনও আমাকে ভুলতে পারেন নি ?' এই কথা শুনে সন্ন্যাসী এত লজ্জা পেলেন যে মাথা নত করে ফেললেন। তিনি সারাজীবনেও আর কখনও মাথা তোলেন নি।

* * *

কাশীতে বিদ্যালাভ করে একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ ব্যক্তি নগরে এলেন। রাজা তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে খুব বন্ধু হয়ে গেলেন। রাজা তাঁকে বাড়ি তৈরি করে দিলেন, বিবাহ দিলেন আর শেষকালে নিজের রাজ্যের অর্ধেক তাঁকে দিয়ে দিলেন। একদিন রাজা সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'যা কিছু আমার আছে, তা তোমারও আছে। বলো তো তোমাতে আমাতে কি তফাৎ ?' ব্রাহ্মণ বললেন—'সময় এবং সুযোগ পেলে জানাব।' একদিন দুজনে চার ঘোড়ার গাড়ি করে বেড়াতে বেরোলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন—'তুমি সেদিন আমাদের মধ্যে পার্থক্য জানতে চেয়েছিল, আমি এখন চলে যাচ্ছি, তুমিও আমার সঙ্গে এসো।' ব্রাহ্মণ এই বলে গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। রাজা শুধু চেয়ে রইলেন। এতক্ষণে তিনি পার্থক্য কি তা বুঝতে পারলেন।

* * *

এক ব্যক্তি সমুদ্রতীরে বসেছিলেন। সে দেখলো এক যুবক কাপড়- চোপড় নিয়ে সমুদ্র-স্নানে এলো। সে কাপড়গুলি সমুদ্র কিনারে রেখে সমুদ্রে স্নান করতে গেল। হঠাৎ এক বিশাল ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তার কাপড়গুলি কিনারেই পড়ে থাকল। লোকটি আর ফিরল না। অন্য ব্যক্তিটি সব দেখল, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা সম্পর্কে সে অবহিত হয়ে গেল। সে তখন উঠে অজ্ঞাতবাসে চলে গেল ভগবদ্ ভজনের উদ্দেশ্যে। আর কখনও ফিরে এল না।

ত্যাগ করতে গেলে বিচার বিবেচনা কীসের ? যে মরে সে কি ভাবনা-চিন্তা করে মারা যায় ?

——— ০ ———